স্বাধীনতা ৭৫:

ইতিহাস স্মরণে বাংলা সাহিত্য

দুই দিন ব্যাপী আন্তর্জাতিক আন্তর্জালিক আলোচনা-চক্র

স্বাধীনতা ৭৫ : ইতিহাস স্মরণে বাংলা সাহিত্য

সংক্ষেপিকা সংকলন

বাংলা বিভাগ

শ্রী রামকৃষ্ণ সারদা বিদ্যা মহাপীঠ

কামারপুকুর, হুগলি,

স্বাধীন ভারত পঁচাত্তরতম বর্ষে পদার্পণ করতে চলেছে। ব্রিটিশ শাসনের লাঞ্ছনা যন্ত্রণা মুছে ফেলতে চাইলেও তাকে অস্বীকার করা যায় না– যাবে না। অর্ধশতাব্দীর বেশি সময় ধরে ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রাম, আন্দোলন, অগণ্য আত্মত্যাগের বিনিময়ে এসেছে এই স্বাধীনতা। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ইতিহাস অতীত সত্যের নির্মোহ ভাষ্য নির্মাণ করে।

ইতিহাসের বৃহত্তর বৃত্তে ইতিবৃত্তের অবস্থান। আধুনিক ইতিবৃত্তের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হল সাহিত্য। নৃত্য, চিত্রশিল্প, সংগীত, কবিতা, নাটক, উপন্যাস, ছোটগল্প, প্রবন্ধ– এ সবই সমাজ-সভ্যতার উন্মেষ, বিকাশ ও পরিবর্তনের কাহিনি ব্যক্ত করে। বাঙালি মানসে পরাধীনতার গ্লানির সার্থক প্রকাশ ঘটল- 'পদ্মিনী উপাখ্যান' কাব্যে– 'স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে, কে বাঁচিতে চায়? দাসত্বশৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে, কে পরিবে পায়'। এই হাহাকারের অনুরণন শোনা গেল 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকে কন্যা ও রাজ্য রক্ষায় ব্যর্থ ভীমসিংহের সংলাপে– 'ভগবতি, এ ভারতভূমির কি আর সে শ্রী আছে'। এই একই সূত্রে রচিত হয়েছে 'আনন্দমঠ' উপন্যাসের 'বন্দে মাতরম' মন্ত্র। ইতিহাস নির্মাণে সৎসাহিত্যও তাই ঐতিহাসিক তথ্যের মতো গুরুত্বপূর্ণ।

স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা ও প্রাপ্তিকে কেন্দ্র করে রচিত বিভিন্ন সাহিত্যিক শাখা, কবিতা, নাটক, উপন্যাস, ছোটগল্প, প্রবন্ধ এবং জনমানস তথা জনচেতনার পথ ধরে এই আলোচনা অগ্রসর হবে। ভারতের স্বাধীনতার আশা-আকাঙ্ক্ষা সমকালীন কবি-সাহিত্যিক-নাট্যকারদের রচনায় যে-ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে তার সন্ধান ও নবভাষ্য নির্মাণ এই আলোচনা-চক্রের মুখ্য উদ্দেশ্য।

স্বাধীনতা ৭৫: ইতিহাস স্মরণে বাংলা সাহিত্য

আন্তর্জাতিক আন্তর্জালিক আলোচনা-চক্র

কার্যনির্বাহী সমিতি

মুখ্য উপদেষ্টা	ড. মৌসুমী ঘোষ অধ্যক্ষ, শ্রী রামকৃষ্ণ সারদা বিদ্যা মহাপীঠ
বিভাগীয় প্রধান	ড. শেখ মহম্মদ, ফারুক সহযোগী অধ্যাপক, বাংলাবিভাগ
যুগ্ম-আহ্বায়ক	ড. অরুন্ধতী সুর, সহযোগী অধ্যাপক, বাংলাবিভাগ
	ড. অনীককুমার সাহা, সহযোগী অধ্যাপক, বাংলাবিভাগ
সদস্য	ড. ফতেমা খাতুন, সহকারী অধ্যাপক, বাংলাবিভাগ
	আব্দুল লতিব খান, এস এ সি টি, বাংলাবিভাগ
	শ্রী অভিজিৎ খান, এস এ সি টি, বাংলাবিভাগ
প্রযুক্তিসহায়তা	শ্রী জয়ন্ত ঘোষ, সহকারী অধ্যাপক, ইংরেজিবিভাগ
	ড. বাবুসোনা সরকার, সহকারী অধ্যাপক, পদার্থবিদ্যাবিভাগ
	ড. সঞ্জীব গিরি, সহকারী অধ্যাপক, রসায়নবিভাগ
	শ্রী তমাল কর্মকার, করণিক
অভ্যন্তরীন মূল্যমান নির্ধারক অনুষদ	
	শ্রী তন্ময় পণ্ডিত, সহকারী অধ্যাপক, ইংরেজিবিভাগ

শুভেচ্ছাবার্তা

সভাপতি

(পরিচালন সমিতি, শ্রী রামকৃষ্ণ সারদা বিদ্যা মহাপীঠ)

E-mail : srsvidyamahapitha@yahoo.com
Website : www.srsvidyamahapitha.org

SRI RAMKRISHNA SARADA VIDYAMAHAPITHA
GOVT. AIDED GENERAL DEGREE COLLEGE
Affiliated to the University of Burdwan
P.O. KAMARPUKUR, DIST. HOOGHLY PIN—712612
ACCREDITED BY NAAC : CYCLE

শীতের রুক্ষতা, গ্রীষ্মের প্রচন্ড দাবদাহ, অতিবৃষ্টি, পৃথিবী জুড়ে মহামারী এইসব কিছুকে উপেক্ষা করে আমাদের ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ৭৫তম বর্ষকে স্মরণীয় করে রাখতে কামারপুকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা বিদ্যামহাপীঠের বাংলা বিভাগ, আন্তর্জাতিক স্তরে বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন সাহিত্যশাখা — কবিতা, নাটক, উপন্যাস, ছোটগল্প, প্রবন্ধ ইত্যাদি সম্পর্কে যে আলোচনা সভার আয়োজন করেছে তা বর্তমান ছাত্র-ছাত্রীদের জিয়নকাঠি এবং বেঁচে থাকার রসদ হবে এটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

আমি এই আলোচনা সভার সার্বিক সাফল্য কামনা করি এবং আলোচনা সভা রূপায়নের সাথে যুক্ত সকলকে হার্দিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি।

শুভেচ্ছান্তে
জগবন্ধু ঘোষ
সভাপতি
পরিচালন সমিতি
শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা বিদ্যামহাপীঠ
কামারপুকুর : হুগলী

১৯.১১.২০২১

শুভেচ্ছাবার্তা

অধ্যক্ষ

শ্রী রামকৃষ্ণ সারদা বিদ্যা মহাপীঠ

Phone - 03211-244224 (Office) / 03211-245444 (Principal Office)
Ph & Fax : (03211) 245444
e-mail : srsvidyamahapitha@yahoo.com
website : www.srsvidyamahapitha.org

SRI RAMKRISHNA SARADA VIDYA MAHAPITHA
[GOVT. AIDED GENERAL DEGREE COLLEGE]
Affiliated to the University of Burawan
P.O. KAMARPUKUR, DIST. HOOGHLY, PIN—712612
NAAC ACCREDITED 2ND CYCLE

'স্বাধীনতা ৭৫ : ইতিহাস স্মরণে বাংলাসাহিত্য' বিষয়ক আলোচনা চক্রটি যে বিষয় নিয়ে চর্চিত হচ্ছে তা খুবই প্রাসঙ্গিক, ভারতের স্বাধীনতা শুধু ইতিহাসের বিষয় নয় — তা বাংলা সাহিত্যকেও প্রভাবিত করেছে। আবার বাংলা সাহিত্যে স্বাধীনতার সুর জেগেছিল রাজনৈতিক স্বাধীনতার লাভের অনেক আগেই, উভয় দিক দিয়েই স্বাধীনতা ও বাংলা সাহিত্য পরস্পরের সাথে যুক্ত।

১৯৪৭ ভারতবর্ষের স্বাধীনতা নিঃসন্দেহে সারাদেশের সাহিত্য সংস্কৃতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়বিভাজিকা তো বটেই। পুনশ্চ, প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও জীনশমো একাত্তর স্বাধীনতা লাভের অভিঘাত দুই বাংলারই সাহিত্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা বিদ্যামহাপীঠের বাংলাবিভাগের আয়োজিত আন্তর্জাতিক এই আলোচনা চক্র বৌদ্ধিক এক্ষেত্রে পথিকৃতের ভূমিকা নিতে চলেছে, এর সাফল্য কামনা করি।

অনেক শুভেচ্ছা ও শুভকামনাসহ

মৌসুমী ঘোষ

Principal
Sri Ramkrishna Sarada Vidyamahapitha
P.O.-Kamarpukur, Dist-Hooghly

S.R.S. VIDYAMAHAPITHA • KAMARPUKUR, HOOGHLY •

সূচিপত্র

বিষয়	আমন্ত্রিত বক্তৃতা	পৃষ্ঠাঙ্ক
স্বাধীনতার পঁচাত্তর : বাংলা কবিতার বিবর্তন	ড. সুমিতা চক্রবর্তী	১
স্বাধীনতা নাকি দেশভাগঃ বাংলা সাহিত্যে ইতিহাসবোধ কিংবা বিস্মৃতির পরম্পরা?	ড. তপোধীর ভট্টাচার্য্য	
বিষয় ও বিষয়ীভাবনাঃ স্বাধীনোত্তর পর্বে বাংলা গল্পের বিবর্তন	শ্রী সাধন চট্টোপাধ্যায় ড. শেখর সমাদ্দার ড. অমিতাভ চক্রবর্তী	
স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা উপন্যাস: ইতিহাসের নির্মাণ	ড. অলোককুমার চক্রবর্তী ড. তপন বাগচী	

গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ

উৎপল দত্তের কল্লোল: পটভূমি নৌ বিদ্রোহ: স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্য ইশতেহার	ড. অর্ধেন্দু সরকার
নরেন্দ্রনাথ মিত্রের স্বাধীনোত্তর ছোটগল্পে নর-নারীর স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গঃ	শ্রী কালীশঙ্কর রায়
উনিশের গণঅসন্তোষ : স্বাধীনতাপরবর্তী বাংলা উপন্যাসে নবমূল্যায়ন	ড. কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায়
স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলা ছোটগল্পের গতি-প্রকৃতি	শ্রীমতী তিস্তা দাস
স্বাধীন কবে হবে বাংলাসাহিত্য প্রশ্ন করে স্বাধীনতার পঁচাত্তর	শ্রীমতী পাপিয়া ঘোষ
দেশভাগজনিত ছিন্নমূল জীবনে স্বদেশ-সংকট ও সংকট মোচন প্রসঙ্গে 'নতুন ইহুদী' –একটি পর্যালোচনা	ড. ফতেমা খাতুন
"আমি ক্লান্ত প্রাণ এক...."	ড. বাপ্পাদিত্য ঘোষ
স্বাধীনতা উত্তর বাংলা সাহিত্যে সত্যজিৎ রায়ের গোয়েন্দা চলচ্চিত্র 'সোনার কেল্লা' ও 'জয় বাবা ফেলুনাথ'	শ্রীমতী বৈজয়ন্তী মুখোপাধ্যায়
উনিশ শতকের বাংলা আখ্যানকাব্যে স্বদেশ-চেতনা	শ্রী মৃন্ময়কুমার মাহাত
জ্যোতির্ময়ী দেবীর 'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা': দেশবিভাগের প্রেক্ষিতে নারীর অবস্থান	ড. সঞ্জয়কুমার ঘোষ
দেশভাগের কথকতা : বাঙালি নারী-র আত্মকথার আলোকে	ড. সুলগ্না খান
স্বাধীনোত্তর কালে বামপন্থী রাজনীতির প্রেক্ষিতে গণনাট্য সংঘের সংগঠন ও নাট্যচর্চার ইতিহাস	শ্রী অর্পণ দাস
পাঁচের দশকের বাংলা কবিতায় স্বাধীনতা-প্রসঙ্গ	শ্রী ইন্দ্রজিৎ ঘোষ
শচীন দাশের উপন্যাসে দেশভাগঃ জ্বলন্ত সময়ের দলিল	জাহিরুল রহমান মণ্ডল
তিলোত্তমা মজুমদারের উপন্যাস: স্বাধীনতা-উত্তর দেশচেতনার বিবর্তন	শ্রীমতী দীপিকা বাড়ই
স্বাধীনতার ইতিহাস স্মরণে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ধাত্রীদেবতা'	শ্রী প্রসেনজিৎ রায়
তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে স্বাধীনতা উত্তর আদিবাসী সমাজ	শ্রীমতী বিন্দারণা দত্ত
'দোজখনামা'- দুই কথক চরিত্রের জবানিতে 'স্বাধীনতা'	শ্রীমতী সুকন্যা চতুর্বেদী
১৯৯২-এর কলকাতার দাঙ্গা ও আফসার আমেদের 'ব্যথা খুঁজে আনা' উপন্যাস	শ্রীমতী সোনালী দাস
'ক্যাম্প সাহিত্য' ও বাঙালির আত্মবিভাজন	শ্রী সৃজন দে সরকার

স্বাধীনতার পঁচাত্তর : বাংলা কবিতার বিবর্তন

ড. সুমিতা চক্রবর্তী

কোনও দেশের স্বাধীনতা একটি রাজনৈতিক ঘটনা। কবিতা এক ভাষা-শিল্পরূপ। কিন্তু মানুষের সৃষ্টি দেশ ও কালের সঙ্গে যেহেতু অবিচ্ছিন্ন তাই যখন একটি দেশ প্রায় দুশো বছরের ঔপনিবেশিক অধীনতার পর স্বাধীন হয়, তখন দেশের মানুষের মনের পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। সাহিতে তার প্রতিফলনও সুনিশ্চিত।

সংক্ষেপে যদি বিষয়টিকে ধারাবাহিকভাবে অনুসরণ করতে হয় তাহলে সময়-খণ্ডের পরিমাপ প্রয়োজন হবে। দশক-ধারণায় আমরা দীর্ঘকাল অভ্যস্ত; যদিও এক-একটি দশকের নির্দিষ্ট বছর অনুসারে সাহিত্যধারার পরিবর্তন হয় না কিন্তু কিছুকাল পরে কয়েকবছর সময়কে একত্রে দেখলে সাহিত্য লক্ষণের বিবর্তন অনুভূত হয়। দশক— এই পরিমাপকটির সঙ্গে মানুষ দীর্ঘকাল পরিচিত। কাজেই সাধারণভাবে দশকের উল্লেখ থাকলে বক্তা এবং শ্রোতা উভয়েরই সুবিধা এবং বিষয়টি খুব অবৈজ্ঞানিকও নয়। ১৯৪৭-এ স্বাধীনতা এবং বঙ্গভূমির বিভাজন। পূর্ববঙ্গ থেকে উদ্বাস্তুদের স্রোত এবং পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির যথেষ্টই বিপর্যয়। এই বাতাবরণে প্রত্যাশিত ছিল যে সমাজের বিপন্নতা, নৈরাশ্য এবং রাজনৈতিক প্রতিবাদের দিকেই কবিতার অভিমুখ হবে। কিন্তু তা হল না। একদিকে বাংলা কবিতার একটি প্রধান ধারা পাঁচের দশকে হয়ে উঠল রোম্যান্টিক লিরিক। অন্যদিকে অবশ্য স্বাধীনতা-পূর্ববর্তী চারের দশকের সাম্যবাদী কবিরা যখন পাঁচের দশকে লিখলেন তখন স্বাধীনতা সম্পর্কে হতাশা ব্যক্ত হয়েছে তাঁদের লেখায়। সাম্যবাদী কবিরাও কয়েকজন ছিলেন কিন্তু সব মিলিয়ে পাঁচের দশকে কেন ব্যক্তিগত অনুভব-প্রধান হয়ে উঠল তার কারণ সন্ধান প্রয়োজন।

স্বাধীনতার বারো-তেরো বছর পরে ১৯৬০-৬১ থেকে বাংলা কবিতায় বেশ চোখে পড়বার মতো বৈচিত্র্য লক্ষণীয়। স্বাধীন দেশের তরুণ কবিরা তখন নিজেদের মতো ভাবতে শুরু করেছেন। কবিতার বক্তব্যে, দৃষ্টিকোণে এবং ভাষায় অভিনবত্বের সন্ধানে তাঁরা তখন আগ্রহী। সত্যিই ছয়ের দশকের বাংলা কবিতায় বিভিন্ন ধরনের কবিতার আন্দোলন দেখা দিল যেখানে কবিরা প্রথাসিদ্ধ পথ থেকে সরে গিয়ে নতুন দিশার সন্ধান করছেন। হতে পারে তার কিছুটা পাশ্চাত্য-দেশ প্রভাবিত; সেই সন্ধানের পথে কিছুটা চমক লাগাবার আকাঙ্ক্ষাও ছিল। তবুও অস্বীকার করা যায় না যে, বাংলা কবিতা ছয়ের দশকে যেভাবে বিভিন্নমুখী হয়েছে তা পূর্ববর্তী দশকে ছিল না ততটা। বাংলা কবিতার জগতে কবির বাচনের শর্তহীন স্বাধীনতা এই দশকেই স্বীকৃত হয়েছিল। 'হাংরি' এবং 'শ্রুতি' আন্দোলনের অভিঘাত কিন্তু বাংলা কবিতায় ব্যর্থ হয়নি। একটি কবিতা শিল্পোত্তীর্ণ হল অথবা হল না তার বিচার করেন ব্যক্তি-পাঠক। কিন্তু কবিতা-সৃষ্টির সমবায়ী ধারণা এই সময়েই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা অস্বীকার করা যায় না। ব্যক্তি-কবির চেয়ে তাই ছয়ের দশকে প্রধান হয়ে উঠেছিল কাব্যজগতে সমবেত অভিব্যক্তির স্ফুরণ।

কিন্তু ছয়ের দশকের শেষে ভারতের সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ক্রমেই যখন পুঁজিবাদের দিকে ঝুঁকে পড়েছে; কৃষক-শ্রমিক সমাজ অবহেলিত—তখন একটা সময় সমাজের উপেক্ষিত শ্রেণি প্রতিবাদী হয়ে উঠলেন। নকশালবাড়ি আন্দোলনের রাজনৈতিক ঘটনাটি বাংলা-সাহিত্যের সর্বক্ষেত্রে ছাপ রেখে গেছে তা মানতেই হবে। সাতের দশকের এই আন্দোলন পশ্চিমবঙ্গের বাইরেও প্রসারিত হয়েছিল। তার চেয়েও বড়ো কথা এই আন্দোলন সচ্ছল মধ্যবিত্ত সমাজের তরুণ-সমাজকে এই প্রথম আন্তরিকভাবে কৃষক-শ্রমিকদের প্রতি সহমর্মী করেছিল। এই সহমর্মিতা কিন্তু দেখা যায়নি উনিশ শতকের নবজাগরণে। দেখা যায়নি এমনকি স্বাধীনতা আন্দোলনেও। কাউকে ছোটো না করেও বলা যায় যে, ভারতীয় সমাজে উচ্চ-বর্গ এবং নিম্নবর্গের যে পরম্পরাবাহী সম্পর্ক তা সাতের দশকেই খানিকটা ভেঙেছিল। আর কিছুটা নড়ে গিয়েছিল তেভাগা আন্দোলনের সময়ে। তেভাগা আন্দোলন স্বাধীনতার পরেও বিস্তৃত ছিল মনে রাখতে হবে।

আটের দশক থেকে বিশ্বের অর্থনীতি এবং অর্থনীতি-কেন্দ্রিক রাজনীতি বিপুলভাবে পরিবর্তিত হল প্রযুক্তির চাপে। বিশ্বায়ন— এমন এক পরিস্থিতি যেখানে বাণিজ্যিক পরিসর মানুষকে বিপুল ব্যক্তি-স্বাধীনতা দেয় কিন্তু সেই ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে এমনভাবে ঘিরে থাকে বিনোদন-বিশ্বের মোহগ্রস্ততা যে, মানুষের ব্যক্তি-স্বাধীনতা অধিকাংশ ক্ষেত্রে মনন ও কর্মের জগতে বিস্তৃত না হয়ে ব্যক্তি-স্বার্থমুখী ভোগবাদিতায় পরিণত হয়। এই পরিবর্তনের ছবি কথাসাহিত্যে যত প্রবল এবং বাণিজ্যিক; কবিতায় ততটা নয়। একুশ শতকের প্রথম দুই দশকও এই সমাজ-লক্ষণ এবং ব্যক্তি-মানুষের প্রবণতাকে লালন করে। এই পরিস্থিতি থেকে যেহেতু আমাদের মুক্তি নেই, এই পরিস্থিতির মধ্যেই কবিতার আশ্রয় এবং মানুষের মনের মুক্তি খুঁজতে হবে।

স্বাধীনতা নাকি দেশভাগঃ বাংলা সাহিত্যে ইতিহাসবোধ কিংবা বিস্মৃতির পরম্পরা?

ড. তপোধীর ভট্টাচার্য

আজ থেকে তিন দশক আগে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে বাকপটু এক রিক্সাচালক কোন এক পরিচিত আরোহী সম্পর্কে বলেছিল, 'গল্প হবে টুকটাক'। চলতে চলতে যত কথা শুনি তার কতটা বা মনে রাখি? কিন্তু ঐ কথাটি ভুলিনি। আমরা যারা বিদ্যায়তনিক রীতিনীতিতে বিশ্বাসী, লক্ষ্যভেদী ও সংক্ষিপ্ত কথার গুণগান করে থাকি। অথচ আজ যে শিরোনাম প্রস্তাব করলাম তা তো যাচ্ছে উলটোপথে। আসলে এই প্রতিবেদক বিনির্মাণে বিশ্বাসী। তাই শিরোনাম থেকেই বিনির্মাণ শুরু করতে চাইছি। স্বাধীনতার ৭৫ বছর পূর্তিতে নিয়মমাফিক স্বাধীনতার জয়বার্তা ঘোষিত হচ্ছে। ইতিহাস, দর্শন, সমাজবিদ্যা, সংস্কৃতিতত্ত্ব, সাহিত্য—প্রতিটি পরিসরে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্তির তাৎপর্য পর্যালোচিত হচ্ছে। কী পেয়েছি, কতটুকু পেয়েছি এর পরিমাপ করতে গিয়ে কী পাইনি, কেন পাইনি তার বিশ্লেষণ হচ্ছে কি আদৌ? ভাবছি কি কেউ, স্বাধীনতা কী? শ্বেতাঙ্গ প্রভুর বদলে স্বদেশি যেসব শাসক রাজপাট সামলে চলেছে, তারা এবং আমরা কি সত্যিই একই দেশের অধিবাসী?

এই যে বললাম 'আমরা' শঙ্খ ঘোষের বিখ্যাত কবিতা-পঙক্তি অনুসরণ করে কি বলব, 'কী আমাদের পরিচয়, মা?' আছে যেহেতু বাংলা সাহিত্যের পড়ুয়ারা এই বিদ্যায়তনিক সম্মেলনে শামিল, বলতেই পারি, আমরা মানে পশ্চিমবঙ্গে এবং পশ্চিমবঙ্গের বাইরে যারা বাংলাভাষায় কথা বলি এবং বাঙালির পক্ষে প্রত্যাশিত স্বাভাবিক সংবেদ শরিক তাদের সাহিত্যই বাংলা সাহিত্য। সেই সাহিত্যে প্রতিফলিত দেশচেতনা, ইতিহাসবোধ, পরম্পরা-পরিশীলন সম্পর্কে কথা বলব, শুনব, ভাবব। তাহলে 'কিংবা'র প্রয়োগ কেন? কেনই বা 'বিস্মৃতির পরম্পরা' শব্দবন্ধে দ্বিধা ও সংশয়ের দ্যোতনা? তবে কি গোড়ায় গলদ রয়ে গেছে? বাংলা সাহিত্যের প্রাসঙ্গিকতা যাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি, সেই বাঙালির অখণ্ড, অবিভাজ্য দেশ তো দ্বিজাতিতত্ত্বের আত্মঘাতী মিথ্যায় টুকরো-টুকরো হয়ে গেছে। ভারত তো ভাগ হয়নি, ভাগ হয়েছিল পঞ্জাব ও বাংলা। রক্তাক্ত পাঞ্জাবে তবু পূর্ব ও পশ্চিমের বিভাজন মাত্র ছিল এবং সেই দুঃস্মৃতি নবগঠিত ভারতরাষ্ট্রের প্রয়োজনভিত্তিক বদান্যতায় অনেকাংশে কাটিয়ে উঠে 'নতুন ঊষার সূর্যের পানে চাহিল নির্নিমিখ'।

কিন্তু বাঙালিরাই কি বোঝে, শুধু পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গ নয়, উত্তরপূর্বের বাঙালি-বসতি মাত্রেই দেশভাগের ফলে উন্মূল? ঝাড়খণ্ড ও বিহারের আগ্রাসনমূলক রাজ্য পুর্নগঠনে বাঙালিদের স্বাতন্ত্র্য মুছে যাচ্ছে? আর আসামের কথা না বলাই ভালো। ধারাবাহিক জাতিবিদ্বেষের জঘণ্যতম অভিব্যক্তি দেখা যাচ্ছে তাদের নাগরিক অধিকার কেড়ে নেওয়ার বেপরোয়া অভিযানে? সর্বত্র বাংলাভাষী মাত্রেই অবাঞ্ছিত অনুপ্রবেশকারী বিদ্বেষপ্রবণ রাষ্ট্রশক্তির কাছে। এই সব কিছুর সূত্রপাত তো তথাকথিত স্বাধীনতায়। তাই এই প্রশ্ন অনিবার্যইঃ স্বাধীনতা নাকি দেশভাগ? প্রভুত্ববাদী শক্তির সাংস্কৃতিক আগ্রাসন কি পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক বাস্তবেও অতিশয় প্রকট নয়? এতে কি মনে হয় স্বাধীনতা বাঙালির জন্যে হয়েছিল? মহাশূন্যে নয়, ইতিহাসের কৃষ্ণবিবরও সব আলো, সব বোধ, সব চেতনা শুষে নেয়। ছিন্নবিচ্ছিন্ন আত্মবিস্মৃত বাঙ্গালি জাতি তার সবচেয়ে ভালো দৃষ্টান্ত। নইলে ভাষা ও ভাষায় সম্পৃক্ত সংস্কৃতি দিয়ে তার জাতিসত্ত্বা নির্ধারিত হয়, এই মৌলিক সত্য ভুলে গিয়ে ধর্মীয় পরিচিতিকে পাশার ঘুঁটির ব্যবহারকারী অবাঙালি রাজনৈতিক খেলোয়াড়দের কাছে বাঙালিরা আত্মসমর্পণ করত না। দেশভাগের পেছনে থাকা সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির জলুষ কাদের কাছে কেন দীর্ঘমেয়াদি তুরুপের তাস তা বুঝিয়ে দেওয়ার জন্যে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন-রবীন্দ্রনাথ- নেতাজি সুভাষ ছিলেন না তখন। এছাড়া কবি নজরুল ইসলাম সে-সময় থেকেও না থাকার মতো। আর, 'শাশ্বত বঙ্গ'-এর সন্ধানী চিন্তাবিদ কাজী আবদুল ওদুদকে অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনাশূন্য বাঙালি বোঝার চেষ্টাই করেনি।

ফলে কন্টকাকীর্ণ অরণ্যপথে বিভ্রান্ত পথিকের মতো বাঙালি দেশভাগকে জাতির আদিপাপ বলে চিহ্নিত করতে পারেনি। ৭৫ বছর ধরে ক্রমশ গাঢ়তর হলো আত্মবিস্মরণ ও আত্মসমর্পণ। ঘটনাবলীর প্রকৃত নিষ্কর্ষ যারা উপলব্ধি করতে অক্ষম, কাদের ইতিহাস আগাগোড়া হয়ে রইল নির্যাস-রহিত, কেন্দ্রচ্যুত ও বিশৃঙ্খল। আর অনিবার্যভাবে সাহিত্যেও প্রকট হয়ে উঠল আত্মনির্বাসিত জাতির শিকড় বিচ্ছিন্নতার ব্যাপক মিথ্যার বেসাতি। বাঙালির ইতিহাস ও সাহিত্য রবীন্দ্রোত্তর পর্যায়ে ক্রমশ ভুলে গেল আলোর বিচ্ছুরণ, বরং কুয়াশার অন্ধকারে ঝাপসা হয়ে গেল পথরেখা। কেননা 'মননে স্বরাজ' অর্জনের বদলে সর্বত্রব্যাপ্ত হলো অসংযোগ ও অসামঞ্জস্যের পীড়ন, বৈষম্য ও অনন্বয়ের চক্রব্যূহ। স্বাধীনতা যেহেতু রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক-

সাংস্কৃতিক মুক্তির সম্মিলিত উপলব্ধি, তার চূড়ান্ত অভাব দ্বারা ক্লিষ্ট বাঙালি জাতির সামূহিক জীবনে চিরস্থায়ী হলো প্রতিকারশূন্য অসাড়তা ও উদ্দীপনার অনুপস্থিতি। অন্তঃসারহীন বিভ্রান্ত ব্যক্তিসত্তার কখনও তিক্ত কখনও আত্মপ্রতারক স্বপ্নালু কথকতা দিয়ে কল্পস্বর্গ নির্মাণ কি সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য? এই প্রশ্নের যথার্থ মীমাংসা যদি করে না থাকি, স্বাধীনতা কিংবা দেশভাগের প্রাসঙ্গিকতা নির্ণয় করব কীভাবে? আদিপাপ সংঘটিত হওয়ার ৭৫ বছর পরে নতুন ভোরে বুঝতে ইচ্ছা করে, সত্যিই কি জীবন চলে গেছে 'কুড়ি কুড়ি বছরের পার?' আমাদের যৌথ স্মৃতির ভাঁড়ার কি এতই রিক্ত, চেতনা ও সংবেদনা এত দরিদ্র যে হাজার বছরের ঐতিহ্য অনিকেত হয়ে গেলেও কোনও বিলম্বিত প্রতিক্রিয়া হবে না?

বাংলা সাহিত্যে সাধারণভাবে এবং উপন্যাসে বিশেষভাবে কতটা তাৎপর্যবহ অলীক স্বাধীনতা? ভাবাবেগের বিহ্বলতায় ভেসে না গিয়ে বাংলাভাষী লিখিয়েরা কতখানি প্রতিপ্রশ্ন তুলেছিলেন স্বাধীনতা নামক কৃষ্ণবিবর সম্পর্কে? আবেগের অতিরেকে আপন অবজ্ঞাত জাতিসত্তার পাতালযাত্রা কি তাদের অপলক দৃষ্টির বিষয় হয়েছিল কখনও? ভেবে দেখেছিলেন কি, দেশ মানে নিছক মাঞ্চিত্র নয়, দেশ মানে হাজার বছরের ভাষা-সংস্কৃতি-মননের শরিক আপন মানুষেরা? সেইসব আপনজনের মধ্যে যেসব বহিরাগত শত্রুরা বড়ো সংখ্যায় ট্রয়ের ঘোড়াদের অন্তর্ঘাতক হিসেবে ব্যবহার করেছিল, তার অভিঘাতে ইতিহাস ও সাহিত্যের সত্য যুগপৎ কীভাবে রূপান্তরিত হয়ে চলেছে তা কি লিখিয়েরা বিশ্লেষণ করেছেন? আমরা আজ বিভিন্ন শিল্পমাধ্যম সহ বাংলা সাহিত্যে বিশ্ববীক্ষা দেশভাগের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ, ত্বরিৎ বা বিলম্বিত প্রতিক্রিয়ার কতখানি রূপান্তরিত হয়েছে সেই পুনর্বিশ্লেষণ অত্যন্ত জরুরি মনে করছি। ভাবছি ইউরোপীয় মনন বিশ্বে আউসহ্বিৎস যদি ইতিহাস ও সাহিত্যের জলবিভাজক রেখা হিসাবে গণ্য হতে পারে কিংবা দুটি বিশ্বযুদ্ধ প্রধান সময়-বিভাজক বলে বিবেচিত হয় – তাহলে বাঙালি জাতির সার্বিক আত্মবিনাশ সূচক সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটি প্রাপ্য অভিনিবেশ পাবে না কেন?

দেশভাগ-পরবর্তী খণ্ডিত বাংলায় আমরা রবীন্দ্রনাথের মতো মহত্তম প্রতিভার পুনঃসৃষ্টি দেখিনি, এমনকী বিভূতিভূষণ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কিংবা সতীনাথ ভাদুড়ির উপস্থিতিও প্রলম্বিত হতে দেখিনি। সেই সঙ্গে আবার তারাশঙ্করের মতো ঔপন্যাসিকেরও প্রতিভার শোচনীয় অপচয় দেখেছি সত্তর দশকের গোড়া পর্যন্ত। এটা ঠিক, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, সমরেশ বসু, কমলকুমার মজুমদার, অমিয়ভূষণ মজুমদার, মহাশ্বেতা দেবী, বিমল কর, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, শহীদুল জহির, হাসান আজিজুল হকদের বিচিত্র আখ্যান বিশ্বে পর্যটন করার সুযোগ পেয়েছি। একদিকে দেখেছি আধুনিকতাবাদী চিন্তার ক্রমিক অবক্ষয়, অন্যদিকে দুই শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে আরোপিত আধুনিকোত্তরবাদের প্রলম্বিত ছায়া। দেখেছি প্রাতিষ্ঠানিকতার বিরুদ্ধে অপ্রাতিষ্ঠানিক চিন্তাধারার দুর্বল প্রতিরোধ। সেই সঙ্গে লক্ষ্য করেছি দেশভাগ জনিত মর্মবেদনার প্রতিস্রোতপন্থী উন্মোচন প্রফুল্ল রায়, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের আখ্যানে। সব মিলিয়ে, বাংলা কথাসাহিত্যের ছন্নছাড়া ও বিকেন্দ্রায়িত সত্য কিন্তু আড়ালে পড়ে যায়নি। আমরা দেখেছি প্রতি-সাহিত্য রচনার আভাঁগর্দ জাতীয় প্রয়াসের ক্ষীণজীবী বিচ্ছুরণও। এদের মধ্যে রয়েছে বাঙালির বিকল চিত্তভূমির খোঁজ, রয়েছে ছিন্নভিন্ন দেশের মধ্যেই অনাবিষ্কৃত আরেক দেশের সন্ধান। কখনও কখনও মনে হয়, সার্বিক উন্মূলতার প্রেক্ষিতে ছন্নছাড়া এক বাঙালি মন শিকড়ের খোঁজে বেরিয়ে বারবার নতুন খাত বেয়ে কেবলই উৎসে ফিরে যেতে চায়। কখনও লক্ষ্য করি, চূড়ান্ত আত্মবিস্মৃতির কাছে আপন আত্মা ও বিবেককে যারা সঁপে দেয়, তারাই নিজেদের অগোচরে দেশভাগের পরিণাম হিসাবে যাবতীয় ভাবাদর্শকে নাস্যাৎ করে চলমান নরকের শরিক হয়ে ওঠে। গত ৭৫ বছরে এভাবেই রচিত হয়েছে বাঙালির বিষাদ-সিন্ধু।

.....

বিষয় ও বিষয়ীভাবনাঃ স্বাধীনোত্তর পর্বে বাংলা গল্পের বিবর্তন

শ্রী সাধন চট্টোপাধ্যায়

গত শতাব্দীর চল্লিশের শতক ছিল সামাজিক ঘটনাবহুল, বিপুল অস্থিরতায় ভরা এবং সমাজের প্রায় সর্বস্তরের মানুষ যেন তাদের জীবনযাপনের ভরকেন্দ্র বিচ্যুত হয়ে পড়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, সুভাষচন্দ্র বসুর দেশ থেকে নিষ্ক্রমণ, জার্মানি কর্তৃক রাশিয়া আক্রমন, ভারত ছাড়ো আন্দোলন, মন্বন্তর, কেবিনেট মিশনের ব্যর্থতা, নৌবিদ্রোহ, কলকাতার দাঙ্গা, ভাষা আন্দোলন, দেশভাগ, নোয়াখালি-বিহার, লক্ষ লক্ষ মানুষের এ বঙ্গে রিফিউজি হয়ে আসা—এ যেন সামাজিক মহামন্থনে ঘটনার ঘনঘটা।

বাঙালি শিল্পী-সাহিত্যিকরা অজস্র ঘটনার চাপকে গল্পে, উপন্যাসে, নাটকে, রঙ-তুলির মাধ্যমে মানবিকতার শিকড়ছিন্নতা থেকে নতুনভাবে বেঁচে ওঠার বলার কথাগুলো মূর্ত করে তুলেছিলেন। তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ, মানিক থেকে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সমরেশ বসুদের মতো তরুণরা যে-ভাবে সোচ্চার হয়েছিলেন, বিজন ভট্টাচার্য, সোমনাথ হোড়, জয়নুল আবেদিনদের মতো নাট্যকার শিল্পীরাও এক্ষেত্রে পিছিয়ে ছিলেন না।

এ-সব স্রষ্টারা ছিলেন নানা পথ, মত ও জীবনদর্শনে বিশ্বাসী। কিন্তু এই কল্লোলিত সময়ে তাঁদের সৃষ্টিতে বিশেষত ছোটগল্পে বিষয়ীভাবনা অর্থাৎ স্টাইল, উপস্থাপনার কৌশল, ভিন্ন কোন মাত্রা লাভ করেনি। বলার কথাটির প্রকাশই ছিল যেন জরুরি – বিষয়টাই গুরুত্ব পেত, কীভাবে প্রকাশ করছি – বিষয়ীভাবনা তেমন জোর পায়নি। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উত্তরকালের গল্পগুলিতে, কিংবা বিভূতিবাবুর 'অশনিসংকেত' বা তারাশঙ্করের 'মন্বন্তর' উপন্যাসে – ক্ষুধা বা অন্নের হাহাকারই ছিল সৃষ্টির ভরকেন্দ্র। যেমন দাঙ্গার বিভীষিকা নিয়ে সমরেশ বসুর 'আদাব' কিংবা রমেশ সেনের 'সাদাঘোড়া'। একটি গল্পের কাঠামোর ভেতর, ভাষার বন্ধনে, আমাদের জাতীয়জীবনের বিশেষ সমস্যাটির প্রকাশ। পাঠকের চেতনায় ঔপনিবেশিক শাসন, জাতীয় চেতনা বোধ এবং সে-সময়ের প্রগতিসাহিত্যের যে প্রবল স্রোতটি ছিল সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা বা সাহিত্যের অন্যতম উদ্দেশ্য সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রতি আনুগত্য সৃষ্টি – তাকেই রূপায়িত করা।

এমন কি, দেশভাগের পরও, যে বিপুল পরিমাণ মানুষ রাতারাতি প্রাণহাতে – দাঙ্গা, হত্যা ও ধর্ষণের ট্র্যাজেডি এড়িয়ে রাতারাতি নিঃস্ব হয়ে এ-দেশে ছিটকে পড়েছিল, তাদের বাস্তুর খোঁজ, দখল, কলোনি পত্তনের ইতিহাস, জীবিকার নতুন নতুন পন্থাই বাংলা ছোটগল্পকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। চটকলের মানুষ, শিল্পাঞ্চলের বস্তিজীবন, মধ্যবিত্ত মেয়েদের ট্রেনে হকারি, নগর-মফঃস্বল-জিলা শহরের জনজীবনের নতুন নতুন ঘটনাই বিষয় বৈচিত্র্যে আমাদের মুগ্ধ করেছে। আর ক্যাম্প, কলোনি পত্তন থেকে পাচার, স্মাগলিং, নতুন জীবিকার সন্ধান বিষয় হিসেবে বাংলা গল্পকে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছে। পঞ্চাশ দশকের তরুণ গল্পকার-প্রজন্ম যে-যে আখ্যান লিখে পাঠকদের চমকে দিয়েছিল, তার মূল চালিকাশক্তি ছিল বিষয়। বিষয়ীভাবনা—অর্থাৎ লেখকের শৈলী ভাষা ও উপস্থাপনার গুরুত্বকেও সমান মর্যাদা দিয়ে বিমল করই পঞ্চাশদশকের শেষে 'নতুন গল্পরীতি'র আহ্বান জানিয়েছিলেন লেখকদের কাছে। বিষয়কে বাদ দিয়ে নয়, গুরুত্ব দিয়েই প্রকাশের নানা পথ—বিষয়ীভাবনা অর্থাৎ লেখকের ভাবনাকে বিষয়ের সঙ্গে মিলিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। সাড়াও জেগেছিল তখন। সমরেশ বসু, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বয়ং বিমল কর এবং তরুণ সন্দীপন, বরেণ গঙ্গোপাধ্যায়, যশোদাজীবন ভট্টাচার্যদের সঙ্গে আরও অনেকেই গল্পে বিষয়ের গুরুত্বকে কিছু তীক্ষ্ণ করেই প্রকাশের বিষয়ীভাবনাকে গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছিলেন। যেন পেণ্ডুলাম চূড়ান্ত বিন্দুতে পৌঁছে, উল্টোটানের যাত্রা শুরু করল। আর সে টানে পেণ্ডুলাম যেমন মধ্যবিন্দুতে থেমে সাম্য রক্ষা করে না, বিপরীত চরমবিন্দুকে ছুঁতে চায়—ষাটের দশকের গোড়ায় চিন-ভারত সীমান্ত সংঘর্ষের পর, বাংলার গদ্য-পদ্যে শুরু হল নানা আন্দোলন। হাংরি, শাস্ত্রবিরোধী, ছাঁচভাঙা, নিমসাহিত্য, শ্রুতি আন্দোলন নামে এ-সব আজ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের বিষয়। এ-সবের বিস্তৃত আলোচনার পরিসর এখানে নেই। শুধু, নমুনা হিসেবে বাংলা গল্পের বিষয়ে শাস্ত্রবিরোধীদের নিয়ে দু-চারটে কথা বলতে চাই। এদের মুখপত্র ছিল 'এই দশক' পত্রিকা। এই পত্রিকার চারটে ঘোষিত নীতির উল্লেখ করছি শুধু। ১) গল্পে আমরা আমাদের কথাই বলব (অর্থাৎ গল্পে কোন বিষয় নয়, বিষয়ীর ভাবনাই গুরুত্বপূর্ণ)। ২) আমরা এখন বাস্তবতায় ক্লান্ত (অর্থাৎ বিষয় সম্পূর্ণতই ত্যাজ্য)। ৩) অতীতের মহৎ সৃষ্টি অতীতের কাছে মহৎ, আমাদের কাছে নয় (অর্থাৎ সাহিত্যে কোন পরম্পরা বা ঐতিহ্য থাকবে না)। ৪) গল্পে এখন যাদের কাহিনি খুঁজবে তাদের গুলি করা হবে।

এরপর, ষাট দশকের মাঝামাঝি থেকে সাহিত্যে শ্লীল-অশ্লীল বিতর্ক জোরালো হতে থাকে। এ-সময়ের গল্প এতটাই বিষয়বর্জিত হতে থাকে, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় 'সুন্দর' জার্নালে লিখতে বাধ্য হয়েছিলেন, বাংলা গল্প এখন একটি চরিত্রকে খাটে শুইয়ে বিষয়ীভাবনার সুতো ছাড়াতে ছাড়াতে যাওয়া। অনেকটা মাকড়সার জাল বোনার মতো।

সত্তর দশকে এসে একঝাঁক তরুণ পেণ্ডুলামকে ফের মধ্যবিন্দুতে নিয়ে আসে। তাঁরা বলে, দেশ, মাটি, ঐতিহ্য এবং সে-সবের শিকড় সন্ধান জরুরি। গল্পে যেমন শৈল্পিক উপস্থাপনা অর্থাৎ স্টাইল খুব জরুরি, তেমনি বিষয়ও সমপরিমাণে গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাগল্পে প্রায় বিংশশতাব্দী জুড়েই এই ভাবনা মুখ্যত হয়ে উঠেছিল।

বিশ্বাস ও নতুন পুঁজিবাদের আগ্রাসনে গল্পে আর একটি নতুন বাঁক লক্ষ্যণীয়। শব্দ, বাক্য, বিষয় খুবই ঝকঝকে, স্মার্ট। পাঠেও টানটান ভাব থাকবে। কিন্তু, পাঠককে ওই পাঠের পর্বটুকুই টেনে রাখবে, তারপরই বিস্মরণ। ভালো গল্প যেমন বেশ কিছুদিন স্মৃতিকে বুঁদ করে রাখে, এ খুবই তাৎক্ষণিক, অনেকটা use এবং throw-এর মতো। পাঠ ফুরোবে, নটে গাছটিও মুড়োবে। এ-ভাবেই বিষয় ও বিষয়ীভাবনার টানাপোড়েনের মধ্যে দিয়ে বাংলা ছোটগল্প বিবর্তিত হয়ে চলেছে।

.....

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা উপন্যাস : ইতিহাসের নির্মাণ

ড. অলোককুমার চক্রবর্তী

উপন্যাসের মূল অবলম্বন যখন মানবজীবন (প্রায় একমাত্র বলা চলে) তখন সেই মানবজীবনের শিল্পরূপায়ণে ঔপন্যাসিক হয় বর্তমান অথবা অতীতকে অবলম্বন করবেন–এটিই স্বাভাবিক। আর যখন অতীত সময়পর্ব অবলম্বন তখন তাকে ইতিহাস বলে চিহ্নিতও করা যেতে পারে সাধারণভাবে। আবার বলি সাধারণভাবে। কেননা, এই প্রসঙ্গেই উঠতে পারে পুরাণ, তাকে অতীত বললেও, ইতিহাস বলে চিহ্নিত করা যায় না। এখন স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা উপন্যাসে ইতিহাসের নির্মাণ প্রসঙ্গটির আলোচনার ক্ষেত্রে প্রথমত আমাদের নজর করতে হয় উনিশ শতকের বাংলা উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে ইতিহাস ও সমকাল অবলম্বনের দ্বান্দ্বিকতাকে। দ্বিতীয়ত আমাদের আলোচনার বিষয় স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা উপন্যাসের গতিমুখের ভিন্নতা এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা উপন্যাসে ইতিহাস নির্মাণের প্রসঙ্গটি। তৃতীয়ত এই আলোচনার ক্ষেত্রে আমাদের উপজীব্য বিষয় হবে স্বাধীনতা-উত্তর ইতিহাস-অবলম্বিত উপন্যাসের ধারাবাহিক পরিচয় প্রদান। আমরা লক্ষ করেছি যে, যেমন কেউ কেউ বার বার উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে ইতিহাস অবলম্বন করেন আবার কেউ কেউ কেবল হয়তো একবার ইতিহাসকে বিষয় করেছেন তাঁর উপন্যাসে। আমাদের কাছে সেটিও বিবেচ্য বিষয় হয়ে উঠবে। চতুর্থত, উপন্যাসে ইতিহাসের নির্মাণ-প্রক্রিয়াটি বুঝতে গেলে উপন্যাসে অবলম্বিত সময় অর্থাৎ উপন্যাসে পরিবেশিত সময়পর্বের সঙ্গে ঔপন্যাসিক যে-কালে বসে লিখছেন সেই সময়পর্বের সংযোগটিও বুঝে নিতে হয়। ফলে এই দিকটিও আমাদের আলোচনার অন্তর্গত হবে। পঞ্চমত, আমরা যেমন পুরাণকে ইতিহাস নয় বলে চিহ্নিত করেছি তেমনি আবার পুরাণকেও ইতিহাসের মাত্রায় উপস্থাপন পরিলক্ষিত হয় স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা উপন্যাসে। এই দিকটিও আমাদের আলোচনার বিষয় হয়ে উঠবে। ষষ্ঠত, ইতিহাস শব্দটি অতীতকাল নির্দেশক সন্দেহ নেই, কিন্তু একই সময়ের মধ্যেই থাকে অনেক সময়পর্ব। উপন্যাসে সমান্তরাল সময়পর্বের চিত্রণ ইতিহাসের নির্মাণ বলে চিহ্নিত করা যায় কি না, সে-ব্যাপারেও আমরা নানা প্রশ্ন তুলব।

উৎপল দত্তের কল্লোল: পটভূমি নৌ বিদ্রোহ: স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্য ইশতেহার

ড. অর্ধেন্দু সরকার

উৎপল দত্তের বহু বিখ্যাত নাটকের মধ্যে ' কল্লোল' অন্যতম। ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে লেখা এই নাটকটির পটভূমি হলো নৌ বিদ্রোহ। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে ১৯ শে ফেব্রুয়ারি যা সংঘটিত হয়েছিল। বোম্বাইয়ের তলোয়ার নামক জাহাজে যার সূত্রপাত। নাট্যকার উৎপল দত্ত তার এই নাটকে স্বাধীনতা সংগ্রামের এক আপোষহীন লড়াই এর ছবি তুলে ধরেছেন।

স্বাধীনতার জন্য ভারতীয় সৈনিকদের আত্ম বলিদান ও দেশের জন্য আত্মত্যাগ কতদূর পর্যন্ত হতে পারে নাট্যকার আলোচ্য নাটকে সেই বিষয়টিই তুলে ধরেছেন। তবে তার সঙ্গে তিনি দেখিয়েছেন একদল শ্রেণীশত্রু কে; যারা প্রকৃত স্বাধীনতা প্রেমীদের জীবনকে পণ্য করেছে তাদের ষড়যন্ত্রের চেহারা। এক অর্থে এটি তাই স্বাধীনতার ইতিহাসের অন্যতর খোঁজও বলা যেতে পারে।

শাহাদাত আলীর 'নৌবিদ্রোহ' পুস্তিকা এবং ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে দেখা' দি ওশান নাটক এর যোগসূত্র হলেও উৎপল দত্ত একে এমন ভাবে ব্যবহার করেছেন যাতে করে নৌ বিদ্রোহ কে তার কল্লোল নাটক নতুন রূপ নিতে দেখা যায়; দেখা যায় তৎকালীন কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ ও মুসলিম লীগের দায়িত্বজ্ঞানহীনতা কে।

উৎপল দত্ত তার নাটকেও খাইবার জাহাজের পরাজয় দেখিয়েছেন। কিন্তু পরাজয়ের চাইতেও বেশি করে দেখিয়েছেন শার্দুল সিং এবং কৃষ্ণা বাই এর লড়াই কে। যাকে নাটক কার কুমার রায় এই নাটকের তাৎপর্যপূর্ণ দিক হিসেবে উল্লেখ করেছেন উৎপল দত্ত নাটক সমগ্র দ্বিতীয় খন্ডর ভূমিকা অংশে।

তাই আলোচ্য গবেষণা পত্রটিতে প্রকৃত স্বদেশ প্রেমী কারা তার অনুসন্ধান করা হয়েছে উৎপল দত্তের কল্লোল নাটকের আলোকে।

চেষ্টা করা হয়েছে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের লিখিত ইতিহাসের সত্যাসত্যকে অনুধাবন করবার।

এই নাটক যখন লেখা হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে তখন কংগ্রেস শাসন ফলে ঐতিহাসিক পটভূমিকার আড়ালে ষাটের দশকের পশ্চিমবঙ্গ ও সেই সময়ের মানুষের অবস্থা এখানে এসেছে কিনা তাও ভিন্নভাবে পর্যালোচনার চেষ্টা হয়েছে।

সর্বোপরি নৌ বিদ্রোহ যে ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসের কেবলই একটা ঘটনা নয়; তা যে জনগণের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতিফলন কল্লোল নাটক সেকথাও নানাভাবে তুলে ধরেছে। তাই এর শিরোনাম দেয়া হয়েছে স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্য ইশতেহার।

বলা যেতে পারে কল্লোল নাটক নৌ বিদ্রোহের প্রতিবাদী সত্তাকে ধারণ করতে সক্ষম হয়েছে। এটি শেষ পর্যন্ত কোনো নির্দিষ্ট সেনাবাহিনীর লড়াই হয়ে থাকে নি। এর সংগ্রামী চেতনা জনমানসে এতটাই প্রভাব বিস্তার করেছে যে ইংরেজরা বুঝতে পেরেছিল আর কোনোভাবেই ভারতে তাদের শাসনববস্থা জারি রাখা সম্ভব নয়। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ভারতের স্বাধীনতা লাভের পিছনে অনেক বিদ্রোহ লড়াই সংগ্রামের পাশাপাশি তাই নৌ বিদ্রোহকেও স্মরণ করতে হয়।

নৌ বিদ্রোহের ঘটনা যে অংশ নয়, তা যে এই সমাজেরই এক বিদ্রোহী রূপ উৎপল দত্ত তাকে নতুনভাবে বলেছেন। যেমনটা তিনি বলবার চেষ্টা করেছিলেন তার মহাবিদ্রোহ নাটকে। ওখানে যেমন কস্তুরী বাইয়ের কথা তুলে ধরেছিলেন এখানে তেমনই কৃষ্ণা বাই।

আরো যে বিষয়টি উৎপল দত্ত বোঝানোর চেষ্টা করেছেন তা হল ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে নামিদামি নেতার পাশাপাশি সাধারণ জনগণের লড়াইয়ের ভূমিকাও কোন অংশে কম ছিল না। কল্লোল নাটকটি স্বাধীনতা সংগ্রামের সেই নবতর অধ্যায়েরও বার্তাবাহক। আলোচ্য গবেষণা পত্রটি সেই দিকটিকেও আলোকিত করতে চেয়েছে।

.....

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের স্বাধীনোত্তর ছোটগল্পে নর-নারীর স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গঃ

শ্রী কালীশঙ্কর রায়

স্বাধীনতা পরবর্তী চল্লিশের দশকের অন্যতম মরমী কথা সাহিত্যিক নরেন্দ্রনাথ মিত্র (১৯১৬-১৯৭৫)। মূলত মধ্যবিত্ত জীবনের রূপকার হিসেবে পরিচিত হলেও তিনি স্বাধীনতা প্রাপ্ত এপার বাংলার অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পালাবদলের ছবি বিশেষত ভৌগোলিক দ্বিখন্ডিত স্বাধীনতায় দেশভাগের মর্মান্তিক যন্ত্রণা-ছিন্নমূল মানুষের জীবন-স্বপ্ন, আশা-আনন্দকে সমূলে উৎপাটিত করে নিক্ষিপ্ত করেছিল নিরাশার অন্ধকারে। যাকে তিনি ছোটগল্পের রূপ দিয়েছেন। দিশাহীন উদ্‌বাস্তু মানুষ পাড়ি জমায় এপার বাংলায়। 'পালঙ্ক'(১৩৫৯) গল্পে দেশভাগের অভিশাপ, নিঃসঙ্গতা, অর্থনৈতিক প্রতিকূলতা, জাত্যভিমান এসবকে ঘিরে কাহিনি আবর্তিত হলেও নরেন্দ্রনাথ মিত্র সমাজের নিষ্ঠুরতা, পাপের কথায় উচ্চকিত না হয়ে মকবুল ও ধলাকর্তার মানবিক উত্তরণের যে ছবি এঁকেছেন তাতেই তাঁর দৃষ্টিকোণের স্বাতন্ত্র্য ও মৌলিকতা ধরা পড়ে।

একান্নবর্তী পরিবারের ভাঙন, চারদেওয়ালের বাইরে বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ ও মূল্যবোধের পরিবর্তন, স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা ও প্রাপ্তির আলেখ্য ফুটে উঠেছে 'কাঠগোলাপ'(১৩৫৫), 'অবতরণিকা'(১৩৫৬), 'অভিনেত্রী'(১৩৫৭) ইত্যাদি গল্পে। 'কাঠগোলাপ' গল্পে দেশভাগের ক্রান্তিলগ্নে কলকাতার ছিন্নমূল জীবনে নীরদ-অণিমার জীবন সংগ্রাম, অণিমার স্টেটাস রক্ষায় সঞ্জীবনী সংঘের বার্ষিক উৎসবের প্রয়োজনে টেবিলক্লথে কাঠগোলাপ তৈরির প্রয়াস যেমন সময়ের পালাবদলে নতুন তাৎপর্য বয়ে আনে; তেমনি নীরদ সেই কাঠগোলাপ ছুঁড়ে ফেললেও অণিমার জীবন-স্বপ্নকে আবারও বাস্তবের রূঢ় ভূমিতে দাঁড় করানোর সংকল্পে নারীর নারী হয়ে ওঠার লড়াই – চিরন্তন প্রচলিত মূল্যবোধ পরিবর্তনেরই স্মারক। 'অবরণিকা'(১৩৬৫) গল্পে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, মন্বন্তর, স্বাধীনতা অর্জন বদলে যাওয়া আর্থসামাজিক সন্ধিক্ষণে ছিন্নমূল সুব্রত-আরতির দাম্পত্য-সংকটে আরতি সংসারের হাল ফেরাতে বাইরের কর্মক্ষেত্রে যোগ দিলেও পরিবারের কাছেই পর্যুদস্ত হতে হয়েছে। তবু তার এই পথ চলায় মূল্যবোধ পরিবর্তন ও ভাঙনের ছবি অত্যন্ত স্পষ্ট। 'অভিনেত্রী' গল্পে যে লাবণ্য অভিনয়ের সেটে আড়ষ্ট হয়েছে সেই আবার ব্যক্তি জীবনের নিদারুণ আর্থিক সংকটে, সময়ের প্রতিকূলতায় স্বামীর অসুখের কাল্পনিক অভিনয়ে বাইরের লোক অনিমেষের সামনে মিথ্যা অভিনয় করতে কুণ্ঠিত হলেও জীবনের লড়াই তাকে অভিনেত্রী করে তুলেছে। গল্পে মূল্যবোধের পরিবর্তনের সঙ্গে জীবন রূপকার নরেন্দ্রনাথ এভাবে মানুষের জীবনের ভিতরে লুকানো জীবনকে শিল্পিত বাস্তবতায় দেখিয়েছেন।

স্বাধীনতা ও দেশভাগ শিকড়ছিন্ন মানুষকে প্রত্যাশা পূরণে জীবন-জীবিকা বদলাতে বাধ্য করেছিল। 'হেডমাস্টার'(১৩৫৬) ও 'ফেরিওয়ালা'(১৩৫৬) গল্পে পেশা বদলানো বা বেছে নেবার সেই ছবি চোখে পড়ে। 'হেডমাস্টার' গল্পে বাস্তুচ্যুত হেডমাস্টার কৃষ্ণপ্রসন্ন বাবু পুরনো শিক্ষা জীবন থেকে সরে এসে ব্যাঙ্কের চাকরি পেয়েও কিভাবে নিজের স্বভাব, আদর্শকে অক্ষুন্ন রেখেছিলেন তা শিল্পের বাস্তবে লেখক নান্দনিক রূপ দিয়েছেন। 'ফেরিওয়ালা' গল্পের প্রফুল্লও স্বাধীনোত্তর অর্থনৈতিক বিপর্যয়ে অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই-এ অধস্তন পেশা ফেরিওয়ালা বৃত্তি নিয়ে মানুষ ঠকানোর কাজে লিপ্ত হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত নিজ প্রেমিকাকে ঠকিয়ে চরম নৈরাশ্যে হাহুতাশ করেছে। রাজনৈতিক ঘটনার ছায়াপাত ঘটেছে 'বিষাদযোগ'(১৩৭৭) ও 'কাঁটাতার'(১৩৭৭) গল্পে। 'বিষাদযোগ' এ সত্তরের দশকের রুদ্ধশ্বাস নকশালপন্থী রাজনীতি ও মানুষের প্রত্যাশা ভঙ্গের ছবি যেমন শিখার প্রেমিকের অকাল মৃত্যুতে শিল্পীর সংযমে প্রদীপ্ত; তেমনি 'কাঁটাতার' গল্পে সত্তরের উত্তাল রাজনীতির প্রত্যক্ষ বর্ণনা না থাকলেও সমকালীন সময় প্রেক্ষিত অনুচ্চ কণ্ঠে উচ্চারিত। দীপার প্রথম প্রেম, ভালোবাসার স্বপ্ন-ভঙ্গে সময়ের বন্ধ্যা রূপই প্রতিবিম্বিত, অনুরণিত।

.....

উনিশের গণঅসন্তোষ : স্বাধীনতাপরবর্তী বাংলা উপন্যাসে নবমূল্যায়ন

ড. কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায়

উনিশ শতকে ইংরেজ শাসনে ক্রমাগত মানুষের মনে ক্ষোভ জমতে থাকে। ইংরেজ সরকার, জমিদার, নীলকর, ব্যবসাদার,মহাজন প্রভৃতিদের অত্যাচারে অত্যাচারিত হতে থাকে উনিশ শতকের সাধারণ মানুষ। মানুষের দীর্ঘদিনের ক্ষোভেরই বহি প্রকাশ হতে থাকে নানা বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে। উনিশ শতকে যেসব বিদ্রোহ সংঘটিত হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ১৮৫৭

খ্রি সিপাহী বিদ্রোহ, ১৮৫৫ খ্রি সাঁওতাল বিদ্রোহ, ১৮৬০ খ্রি. নীলবিদ্রোহ, ১৮৯৯ খ্রি মুন্ডা বিদ্রোহ প্রভৃইত। স্বাধীনতাপূর্ববর্তীকালে যেমন এইসব বিষয়কে অবলম্বন করে উপন্যাস রচিত হয়েছে তেমনি স্বাধীনতাপরবর্তীকালের ঔপন্যাসিকরাও এইসব বিদ্রোহকে তাঁদের উপন্যাসের বিষয়বস্তু করেছেন।

উনিশ শতকে যে সমস্ত বিদ্রোহ সংঘটিত হয় তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহ। অন্য কোনও বিদ্রোহ এত বেশি প্রসার লাভ করেনি। ১৮৫৭ খ্রি বিদ্রোহ বাংলা উপন্যাসকেও খুব বেশি প্রভাবিত করেছিল। এই বিদ্রোহ সমকালে এবং পরবর্তীকালে ঔপন্যাসিকদের দ্বারা নিন্দিত ও নন্দিত হয়েছিল। স্বাধীনতাপূর্ববর্তীকালে ইংরেজদের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করা সহজ কাজ ছিল না। রাজশক্তির সঙ্গে প্রকাশ্যে সংঘাতে যেতে চাননি বাঙালি লেখকেরা। তাই অনেকে এই বিদ্রোহের নেতা-নেত্রীদের নিন্দা করেছেন। কিন্তু স্বাধীনতাপরবর্তী বাংলা উপন্যাসে সিপাহী বিদ্রোহের নেতা ও নেত্রীদের নিন্দার ধারা লুপ্ত হতে দেখা যায়। স্বাধীনতাপরবর্তী উপন্যাসগুলি ইতিহাসসম্মত। অলৌকিকতা, অবাস্তবতা এই উপন্যাসগুলিতে দেখা যায় না। অত্যাচারিত গণমানুষের কণ্ঠস্বর প্রাধান্য পায় এই পর্বের উপন্যাসগুলিতে। রাজা-রাজড়ার গন্ডী পেরিয়ে উপন্যাসে চর্চিত হয় নিম্নবর্গের মানুষ।

উনিশ শতকে ঘটে যাওয়া সিপাহি বিদ্রোহের মতো নীলবিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ, মুন্ডাবিদ্রোহ সম্পর্কেও একই কথা বলা যায়। তবে প্রকৃতিগত দিক থেকে নীলবিদ্রোহ সম্পর্কে বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের অবস্থান ছিল কিছুটা স্বতন্ত্র। পরাধীন থাকা সত্ত্বেও স্বাধীনতাপূর্ববর্তীকালে যে বিদ্রোহ বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের দ্বারা নন্দিত হয়েছিল স্বাধীনতাপরবর্তীকালে সেই বিদ্রোহ যে প্রশংসিত হবে তা বলাই যায়। নীলকরদের অত্যাচার এবং নীলচাষীদের প্রতিরোধ স্বাধীনতাপরবর্তীকালের ঔপন্যাসিকরা দক্ষতার সঙ্গে অঙ্কন করেছেন। সাঁওতালবিদ্রোহ সম্পর্কে স্বাধীনতাপূর্ববর্তীকালের ঔপন্যাসিকদের মনোভাব জানা যায় না। তবে উনিশ শতকের বুদ্ধিজীবীসমাজ এই বিদ্রোহকে সমর্থন করেন নি। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় 'অরণ্যবহ্নি' উপন্যাসে সিধুকানু সম্পর্কে যথার্থ মূল্যায়ন করার চেষ্টা করেছেন। চেষ্টা করেছেন মহাশ্বেতা দেবীও 'অরণ্যের অধিকার' উপন্যাসে বীরসা মুন্ডা সম্পর্কে।

পরিশেষে বলা যায় স্বাধীনতাপরবর্তীকালের ঔপন্যাসিকরা স্বাধীনভাবে লেখনী ধারণ করার জন্য বিদ্রোহ সম্পর্কে তাঁদের মূল্যায়ন হয়েছে যথাযথ। গণমানুষের কণ্ঠস্বর এই উপন্যাসগুলিতে প্রাধান্য পেয়েছে। নিম্নবর্গের চর্চাও তাঁরা করেছেন সেইসূত্রেই।

ইতিহাস স্মরণে বাংলা সাহিত্য

.....

স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলা ছোটগল্পের গতি-প্রকৃতি

তিস্তা দাস

শুধুমাত্র ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়-ই নয়...মানবসভ্যতা, সাহিত্য, সংস্কৃতি সবকিছুই সময়-কেন্দ্রিক। সাহিত্য যেমন সমাজের দর্পণ ঠিক তেমনই সময়েরও দর্পণ। সময়ের দলিল। বাংলা সাহিত্যের আদিযুগের প্রাচীনতম নিদর্শন সেই চর্যাগান থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যের সর্বক্ষেত্রেই আর্থসামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক পালাবদল বা ক্রমবিবর্তন লক্ষণীয়।সেই সহজাত নিয়মেই ভারতবর্ষের তথা বাংলার স্বাধীনতা লাভের সমকালে ও পরবর্তীকালে বিগত অর্ধ শতাব্দীরও বেশি সময় জুড়ে যে আর্থসামাজিক মূলত রাজনৈতিক পালাবদল (১৯৪১-১৯৫০খ্রিঃ) ঘটতে থাকে তার অনিবার্য প্রভাব সাহিত্যের সব শাখার ন্যায় ছোটগল্পেও পড়েছে।

প্রথমত দুই বিশ্বযুদ্ধ, চল্লিশের মন্বন্তর, দেশবিভাগ, স্বাধীনতালাভ, সাম্প্রদায়িকতা ও উদ্বাস্তু সমস্যা, কৃষক আন্দোলন, স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতবর্ষের স্বপ্নভঙ্গের বেদনা, রাজনৈতিক সঙ্কট, খাদ্য আন্দোলন ও ভূমি আন্দোলন, রেল ধর্মঘট, দেশ জুড়ে জরুরি অবস্থা জারি, নকশাল আন্দোলন, বামপন্থার বিকাশ, বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলন ও স্বাধীনতার যুদ্ধ বাঙালি জন-মানসে গভীর

প্রভাব বিস্তার করে।বাংলা ছোটগল্পেও এর যুগান্তকারী পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। এই পরিবর্তন যেমন ভাবের দিক থেকে ঠিক তেমনই ভাষা, আঙ্গিক সর্বক্ষেত্রেই বিদ্যমান।

এই সামাজিক পটভূমিতে যে সকল গল্প লেখকদের নাম পাচ্ছি তাঁরা হলেন, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রবোধকুমার সান্যাল, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজকুমার রায়চৌধুরী, প্রমথনাথ বিশী, পরিমল গোস্বামী, বনফুল, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, নবেন্দু ঘোষ, ননী ভৌমিক, আশাপূর্ণা দেবী প্রমুখ।

স্বাধীনতা সমকাল ও পরবর্তীকালে যে সকল তরুণ গল্পলেখকদের পরিচয় পাওয়া যায় তাঁরা সকলেই কল্লোল, কালিকলম, বিচিত্রা, উপাসনা, শনিবারের চিঠি, প্রবাসী পর্বের পরবর্তী গোষ্ঠীভুক্ত। স্বাভাবিকভাবেই এদের মনোভাব ও জীবন দর্শন ভিন্নতর। সুবোধ ঘোষের লেখার মধ্যে তাঁর প্রথম পরিচয় পাওয়া যায়। এই গোষ্ঠীর সাহিত্য চেতনা ও জীবনবোধের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৯৪১-১৯৫০ খ্রিঃ এই সময়ে যারা ছোটগল্পের আসরে দেখা দিয়েছিলেন তাঁদের সময়টাই ছিল গভীর সংকটের, অন্ধকারের ও অনিশ্চয়তার, মূল্যবোধের অবক্ষয়ের। এই পর্বের গল্পলেখকরা হলেন- নরেন্দ্রনাথমিত্র, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, নবেন্দু ঘোষ, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, সন্তোষকুমার ঘোষ, বিমল কর, সমরেশ বসু, রমাপদ চৌধুরী। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সুধীররঞ্জন মুখোপাধ্যায়, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ দাস- এঁদেরই সহযাত্রী। তবে এঁদের মধ্যে সমরেশ বসু, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখের গল্পে যদি সমাজ চিত্র ও সামাজিক সমস্যা ও অবক্ষয়ের দিকটি সুস্পষ্ট থাকে তবে নরেন্দ্রনাথ মিত্র, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, সন্তোষকুমার ঘোষের গল্পে অন্তর্মুখীন মনের জট ও জটিলতাই প্রধান বিষয়।

তিরিশের দশকের শান্তি, স্বস্তি, মন্থরগতি, শরৎচন্দ্রীয় রোমান্টিকযুগ, বিভূতিভূষণের প্রকৃতি-মুগ্ধতা, কল্লোলীয় যুগের উদ্দীপনা এই পর্বের গল্পকারের গল্পে স্বাভাবিকভাবেই ছিল না।

বাঙালি নিম্নমধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের আশা-আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ-বেদনা, হতাশা ও ব্যর্থতার সফল রূপকার নরেন্দ্রনাথ মিত্র। 'রস', 'দোলা' প্রভৃতি গল্প উল্লেখযোগ্য। স্বাধীনতা পূর্ববর্তী বিপর্যয়ের পটভূমিতে, মহাযুদ্ধ ও মন্বন্তরের অশান্ত দিনগুলির পটভূমিতে গল্প লেখেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। 'দুঃশাসন', 'নক্রচরিত' ও 'পুষ্করা' গল্পে তার পরিচয় পাওয়া যায়। এই সমকালেই মননচিন্তায়, আত্মজৈবনিক দৃষ্টিতে, ব্যঞ্জনা সৃষ্টিতে, ব্যক্তির অস্তিত্ব বিশ্লেষণে তীক্ষ্ণ, মার্জিত, ইঙ্গিতধর্মীভাষায়, হৃদয়ের সূক্ষ্মতম অনুভব প্রকাশে যিনি স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট তাঁর নাম সন্তোষকুমার ঘোষ। 'ছায়া', 'শোক', 'হরিণ', 'কানাকড়ি', 'কস্তুরীমৃগ', 'যাদুঘর', 'একমেব', 'শনি', 'ধাত্রী','দিনপঞ্জি', 'ছোটকথা'-এসব গল্পে সন্তোষকুমারের তীক্ষ্ণ, নির্মোহ লেখনীমুখে সমাজ ও ব্যক্তির ব্যবচ্ছেদ করেছেন।

স্বাধীনতা প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই যে সব গল্পলেখক এসেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সতীনাথ ভাদুড়ি। পঞ্চাশের দশকের শেষে ষাটের দশকের শুরুতে বাংলা ছোটগল্পে নতুন আন্দোলনের মুখপাত্র রূপে নেতৃত্ব দিয়েছেন বিমলকর। এই সমসাময়িককালের উল্লেখযোগ্য গল্পকার হলেন শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, মতি নন্দী, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, দিব্যেন্দু পালিত, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, প্রফুল্ল রায়, কবিতা সিংহ, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।

স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলা ছোটগল্পের যে গতি-প্রকৃতি তা কালক্রমে কীভাবে ক্রম-বিবর্তিত হয়েছে তা-ই এই সংক্ষিপ্তসারের মূল আলোচ্য বিষয়।

স্বাধীন কবে হবে বাংলাসাহিত্যপ্রশ্ন করে স্বাধীনতার পঁচাত্তর
কাব্যগুণে রূপমের লিরিক গানে গানে দেয় উত্তর।

শ্রীমতী পাপিয়া ঘোষ

রূপম ইসলামের কণ্ঠস্বর-ই শুধু শক্তিশালী নয়, তাঁর কলমেও যে অসীম শক্তি আছে সেটা তাঁর লিরিক পড়লে অথবা তাঁর গান শুনলেই বোঝা যায়। রূপম তাঁর কিছু কিছু গানকে করেছেন কবিতা, আর কিছু কিছু মুখের কথাকে করেছেন গান। রূপম হলেন, আমাদের—ভারতীয় বব ডিলান। রূপম তাঁর 'Joan Of Arc' গানে লিখেছেন—

'পোড়ে স্বাধীনতা দারুণ দহনে

পোড়ে প্রকাশ্যে অথবা গোপনে
তার ভস্ম মেশে কোন সমুদ্রতে'

আজ স্বাধীনতার ৭৫ বছর পরেও লাইনগুলো খুবই খাঁটি ও প্রাসঙ্গিক। দেশতো অনেক বছর হ'ল স্বাধীন হয়েছে কিন্তু আমরা আদৌ প্রকৃত অর্থে স্বাধীনতা পেয়েছি কি? এই প্রশ্ন আমাকে প্রতিনিয়ত কুঁড়েকুঁড়ে খায়। আমাদের সকলের মতপ্রকাশের স্বাধীনতা যদি থাকত তাহলে আজ ভারভারা রাওকে জেলে বন্দি থাকতে হ'ত না।যদি মেয়েদের স্বাধীন ভাবে চলাফেরার স্বাধীনতা থাকত তাহলে নির্ভয়াকাণ্ড ঘটত না। রূপম তাঁর ২২ বছর বয়সে লিখেছিলেন—

'স্বাধীনতা সব্বার ভালো চায়,
মরবার পর তাকে পাওয়া যায়।'

এই একই কথা বব ডিলান ঠিক একবছর আগে তাঁর গানে বলেছেন—

'Freedom Freedom
Freedom over me
I hate to tell you Mr. only dead men are free.'

বর্তমান সময়ে বাংলাভাষা মৃতপ্রায়। বাংলায় কথা বলা নাকি অপ্রতিভ-র লক্ষ্মণ। বাংলা ভাষায় কোনও কিছু লেখা মানে তা প্রায় মূল্যহীন। বাংলামাধ্যম স্কুলে পড়াশোনা করা যেন পাপ! আর বাংলাভাষার এই সঙ্কটকালে বেশ কিছু কবি, লেখক, শিল্পী তাঁদের লেখনী সম্ভার দিয়ে বাংলাভাষাকে টিকিয়ে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছেন। রূপম ইসলাম তাঁদের মধ্যে অন্যতম। সম্পূর্ণ একটা বিদেশি কালচারকে নিজের দেশে প্রতিষ্ঠা করার জন্য অসীম সাহস আর ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হয়েছে রূপম ইসলামকে। বর্তমানে তিনি একজন সফল গীতিকার, সুরকার তথা একজন বিখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী। রূপমের গানের বেশ কিছু লাইন যা সমাজকে বদলানোর জন্য যথেষ্ট। যা সমাজের রাজনৈতিক দলাদলি অথবা সমাজে ঘটে যাওয়া অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের হাতিয়ারস্বরূপ।

'আমি মানুষের স্বাধীনতা চাই
আছি মানুষের বিপ্লবে তাই' (গান – সংহতি জানাই)।

রূপম তাঁর 'দানিকেন' গানে লিখেছেন—

'চলাচল করি কল্পনাতে
অভিযান তাই ন হন্যতে'

কোনও গীতিকার আদতে একজন কবি না হলে এত সুন্দর লাইন লিখতে পারেন না।

'ন হন্যতে' মানে যাকে হনন করা যায় না। অর্থাৎ যাকে বধ করা যায় না। সত্যি আমরা আমাদের কল্পনাকে কখনও খুন করতে পারি না। আর আমাদের কল্পনাই হ'ল একমাত্র সৎ। আমাদের কল্পনা ছাড়া বাকি আর সব কিছুতেই কম-বেশি রঙ মেশানো থাকে। আমাদের অনুভূতিকে মেরে ফেলা যায় না বলেই হয়তো মৈত্রেয়ী দেবী তাঁর উপন্যাসের নাম 'ন হন্যতে' রেখেছিলেন। মির্চা ইউক্লিডের সাথে প্রেমটা কাঙ্ক্ষিত পরিণতি পায়নি ঠিকই, কিন্তু তাঁর মনের মধ্যে যে অনুভূতি রয়ে গেছিল তাকে হনন করা যায়নি। তাঁর মনে যে প্রেমের সঞ্চার হয়েছিল তাকে বধ করা যায়নি। মৈত্রেয়ী দেবীর উপন্যাস পড়েই 'ন হন্যতে' শব্দ দুটির সঙ্গে আমি এত সুন্দরভাবে পরিচিত হই। আর দ্বিতীয়বার শব্দ দুটিকে আবারও আমি আবিষ্কার করি রূপমের 'দানিকেন' গানে। সেই শিল্পই প্রকৃত শিল্প যা আমাদের আনন্দ দেওয়ার পাশাপাশি আমাদের শিক্ষা ও প্রদান করে।

রূপম হ'ল বাংলা গানের সেই আগ্নেয়গিরি যার অগ্ন্যুৎপাতের উত্তাপে বাংলা গান আরও দৃঢ়, আরও মজবুত হয়। রূপম হ'ল সেই প্রবল জলোচ্ছ্বাস যার স্রোতে ভেসে যায় ভণ্ডগীতিকারেরা। রূপম হ'ল সেই ঝড় যার তাণ্ডবে সমস্ত পুরাতন ধ্যান-ধারণা ভেঙে চুরে নতুনকে আহ্বান জানায় ।

খুব মনোযোগ সহকারে ভাবলে রূপমের লিরিকে এক মহাসমুদ্র খুঁজে পাওয়া যাবে। আমি সেই মহাসমুদ্র থেকে এক ঘটি জল তোলার চেষ্টা করেছি মাত্র। আসলে আমার কাছে রূপম মানে সকালের প্রথম সূর্যোদয়। রূপম মানে স্নিগ্ধ আলোর গোধূলিবেলা। রূপম মানে ক্ষ্যাপা বাউল। রূপম মানে একরাশ বিশুদ্ধ বাতাস, আর রূপম মানে জীবন।

'চলো দিই অনেক পথের পাড়ি
ফেলে যাই অতীতের শহর

শহরেই মৃত্যু আসবে জানি
অবশ্য জীবন চেনার পর'

(গান— চলো আজ দেখব তোমার বাড়ি)

.....

দেশভাগজনিত ছিন্নমূল জীবনে স্বদেশ-সংকট ও সংকট মোচন প্রসঙ্গে 'নতুন ইহুদী' –একটি পর্যালোচনা

ড. ফতেমা খাতুন

'স্বদেশ' অর্থাৎ 'জন্মভূমি' হল মানুষের আত্মপরিচয়ের ভিত্তিভূমি। অনিবার্য কারণবশত যখন কোনো মানুষকে সেই ভূমি থেকে উৎখাত হতে হয় তখন আক্ষরিক অর্থেই তার মূল ছিন্ন হয়ে যায়। আর সেই ছিন্নমূল মানুষের শিকড় ছেঁড়া মনে তখন এক কঠিন বিপর্যয় ঘটে যায় যা তাকে 'নিজের দেশ' সম্পর্কেই সন্দিহান করে তোলে। স্বদেশের প্রকৃত অর্থ অন্বেষণে ব্যর্থ মানুষটির তখন আত্মজিজ্ঞাসা হয় 'কোনটা আমার নিজের দেশ?' অথবা 'আমার পরিচয় কি?' ইত্যাদি। বাংলা আখ্যানে সুপ্রাচীন কাল থেকেই ছিন্নমূল মানুষের সমস্যা ও ব্যথা বেদনার পরিচয় প্রকাশ পেলেও স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলা আখ্যানে এটি একটি বহু চর্চিত বিষয়।

ছিন্নমূল মানুষের জীবনযন্ত্রনা বা জীবনের সমস্যা-সংকট নিয়ে রচিত সলিল সেনের 'নতুন ইহুদী' (১৯৫১) নাটকে এই স্বদেশ-সংকটের বিষয়টি নাটকের বিভিন্ন চরিত্রের সংলাপে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আলোচিত। নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র পূর্ব পাকিস্তানের মাধ্যমিক স্কুলের ভি. এম. পাশ পণ্ডিত মনমোহন ভট্টাচার্য। স্বাধীনতার জন্য দেশবিভাগের অনিশ্চিত অন্ধকার পণ্ডিতের পরিবারকে যেভাবে ভাগ্যহীন উদ্বাস্তুতে পরিণত করেছিল তারই নির্মম পরিণতি এই নাটকে অঙ্কিত হয়েছে।

মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তানের ইস্কুলে সংস্কৃত পড়ানো নিষিদ্ধ হলে তীক্ষ্ণ আত্মমর্যাদাসম্পন্ন পণ্ডিত নতুন চাকরির আশায় পাকিস্তান ছেড়ে কোলকাতায় চলে আসার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু শুভাকাঙ্ক্ষী মুসলমান মীর্জা সাহেবের শত চেষ্টাতেও গ্রাচুইটির টাকাটা জোগাড় না হওয়ায় বাধ্য হয়ে পণ্ডিতকে বাড়ি বিক্রির কথা ভাবতে হয়। তখন অসহায় পণ্ডিতের মর্মবেদনা-"...লজ্জায় কিষ্টোরে কইতে পর্যন্ত পারলাম না যে লক্ষ্মী বেচতাছি। গ্রাচুইটির টাকাটা পাইলে আর বেচতাম না। যদি কইলকাতায় কোন কাজ টাজ পাইয়া যাই, তখন গ্রাচুইটির টাকাটা দিয়া আবার এই রকম বাড়ী আপনে কিন্যা দিতে পারবেন না, মৌলভী সাহেব?"আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করে যায়। বাস্তুহারা লক্ষ্মীছাড়া হয়ে পণ্ডিত নিজের ঠিকানাটুকু হারিয়ে ফেলতে চান নি।

বাস্তু হারানোর বেদনা পণ্ডিতের ট্র্যাজেডিকে মর্মস্পর্শী করলেও নাটকে স্বদেশ-সংকটের বিষয়টি গভীরভাবে আলোড়িত করেছে পণ্ডিতের কনিষ্ঠ পুত্র মোহন চরিত্রটিকে। দেশত্যাগের পূর্বেই দেশছাড়ার সিদ্ধান্তের কথা শুনে মোহনের প্রতিক্রিয়াগুলি তাই যে কোনো অনুভূতিশীল হৃদয়ে প্রশ্ন জাগায়। যেমন দেশভাগের দিন ইস্কুলের বক্তৃতায় ইস্কুল কমিটির প্রেসিডেন্টের মুখে 'দেশভাগ না হলে মুসলমানরা হিন্দুর হাতে পরাধীন থাকতো' শুনে তার মনে পরে গেছে দেশের জন্য জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রাণ দেওয়ার কথা। মীর্জা সাহেবকে তার সঙ্গত প্রশ্নঃ " ... সে যে দেশের লেইগা পরানটা দিল, সে কি হিন্দু মুসলমান ভাগ কইরা, কোন লোকেরে বাদ দিয়া স্বরাজ চাইছিল?" কিম্বা মীর্জা সাহেবই তাদের বসত বাড়ী বিক্রির ব্যবস্থা করে দিয়েছে শুনে তার প্রতিক্রিয়া " আমরা যামু হিন্দুস্থানে, যদি পাকিস্তানে আমাগো সম্পত্তি থাইক্যা ভোগ না করতে পারি – তবে প্রাণে জ্বালা থাকবো, থাকবো হিংসা।...আপনে ভালই করছেন। আপনে আমাগো মোহ কাটাইয়া দিছেন,...দেশ কথাটা শুধুই মোহ।" স্বদেশের অন্বেষণে তার মানসিক সংকটকে স্পষ্ট করে দেয়। এই সংকট থেকে তাকে সাময়িক মুক্তি দিতে মীর্জা সাহেবের কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে স্বদেশের প্রকৃত সংজ্ঞাঃ 'দেশ কথাটা মোহ নারে, দেশ মাইনষের মনে। জমির উপুর দেওয়াল তুলছে- মনে য্যান তুলতে না পারে।' নাটকও শেষ হয়েছে মোহনের সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলার অঙ্গীকার আর হিন্দু মুসলমানের মিলিত সহাবস্থানে এক অবিভক্ত বাংলার স্বপ্নে।

“আমি ক্লান্ত প্রাণ এক....”

ড. বাপ্পাদিত্য ঘোষ

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নন্দী এবং নরেন্দ্রনাথ মিত্র- দুজনেই বিশশতকের কথাকার। শ্রেষ্ঠ নয় হয়তো। জনপ্রিয় বললেও হয়তো বেশি বলা হবে। তবে তাঁরা দুজন-ই ব্যতিক্রমী পথের পথিক –পরিচিত সড়কের সাথী নন। রবীন্দ্র-শান্ত স্নিগ্ধ আদর্শে তাঁরা বিশ্বাসী নন – বরং তাঁরা কল্লোলীয় কবি গোষ্ঠীর অনুসারী। আমাদের আলোচনার বিষয় এই দুজন ঔপন্যাসিকের দুটি উপন্যাস। একটি ‘বারো ঘর এক উঠোন’ এবং অন্যটি ‘চেনামহল’। ‘বারো ঘর এক উঠোন’–এ লেখক দেখাতে চাননি মানুষের জীবনের চাকরি চলে যাওয়ার বিপন্নতা অস্বচ্ছলতা। বা এ উপন্যাস স্বাধীনতা-উত্তর সময়ের অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ নয়। লেখক দেখাতে চেয়েছেন মধ্যবিত্ত মন, মানসিকতা; তার আত্মছলনতা। সেই সঙ্গে যা চায় সেই উচ্চবিত্তের অন্তঃসার শূন্যতা। যদিও আরো অন্যান্য চরিত্রের তুলনায় শিবনাথের উপস্থিতি, তার দৃষ্টিকোণ, তার অন্তরুক্তি এ উপন্যাসে সবচেয়ে সক্রিয়। তার চোখ দিয়েই বারোটি ঘরের কাহিনি উপস্থিত। শিবনাথের সবথেকে প্রকট তার আত্মছলনা। একদিকে দরিদ্র প্রতিবেশিদের ঘৃণা অন্যদিকে ধনীবাড়িওয়ালার প্রতি তোশামোদ– সব মিলিয়ে মধ্যবিত্ত মন ও মানসিকতার অপূর্ব শিল্পরূপায়ন এই উপন্যাস। শিবনাথকে গুপ্ত বা বিধুমাস্টারকে ঘৃণা যখন করে তখন চরিত্রহীন অর্থওয়ালা রমেশের সঙ্গে সম্পর্কের বাঁধনকে দৃঢ় করে। তার প্রতিবেশিদের সম্পর্কে মনেহয়– “যেন কি এক অদ্ভুত কথা তারা তুলে দিতে সারাক্ষণ গলা বাজিয়ে আছে ...টেনে নিতে চাইছে নিজেদের মধ্যে। নিজেদের নোংরা কুশ্রীতা, বীভৎ সঙ্গের গভীর পঙ্কে” অথচ পরিণামে দেখি গভীর পঙ্কে সে নিজেও পৌঁছে যায়। বাড়িওয়ালার ভোটের কাছে মৃত রমেশের জায়গা নিতে সে দ্বিধা করে না। নিজেদের সবটুকুই মান খুইয়ে পরোক্ষভাবে স্ত্রী – স্বাধীনতার নামে স্ত্রীর ইজ্জত খুইয়ে সে তার কাঙ্ক্ষিত চাকচিক্যের জায়গায় পৌঁছাতে চায়, পৌঁছেও। এইভাবে –‘পুতুল নাচের ইতিকথা’-র শশীর সঙ্গে সে অভেদ ও অভিন্ন হয়ে যায়।

স্বাধীনতা- উত্তর সময়ের আরেকজন শিল্পী, সাহসীশিল্পী নরেন্দ্রনাথ মিত্র। নিরাসক্ত মন নিয়ে বাস্তবতার গভীর গহনে ডুবে মধ্যবিত্তের মন আর মননকে নিপুণ তুলিতে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। অচেনা মহল নয়, আমাদের সকলের চেনা মহলের খুঁটিনাটি নানান ঘটনাবর্তের জোয়ার উপ্‌চে পড়েছে উপন্যাসের কোণায় কোণায়। স্বাভাবিকভাবে উঠে এসেছে পারিবারিক ঈর্ষা, হিংসা, বিদ্বেষ, ভ্রুকুটি, রাগ-অভিমান, অভিসম্পাত যার পরিণতি ঝগড়া, ঝামেলা, দ্বন্দ্ব। পাশাপাশি এই উপন্যাসে বড় জায়গা জুড়ে আত্মপ্রকাশ করেছে প্রেম। অবৈধপ্রেম, যা সনাতন ধর্মে অস্বীকৃত। ইসলাম ধর্মে আত্মীয়দের মধ্যে বিবাহ বন্ধন সমাজ-স্বীকৃত, সমাজ সমর্থিত। কিন্তু এই উপন্যাসে একাধিক চরিত্রের মননে যে প্রেম লালিততা সমাজ নিন্দিত। মাসতুতো-পিসতুতো ভাইবোনের প্রেম-পাপ। ঔপন্যাসিক অরুণ-করবী, অতুল-রমা,বিজু=প্রীতি এদের সম্পর্কের জটিল দিক দেখাতে ব্যস্ত হলেও আমাদের মনে হয় অরুণের দিকে তিনি একটু বেশি নজর দিয়েছেন। বিধবা করবীকে অরুণ ভালোবাসলেও শেষ পর্যন্ত অরুণ মায়ের আঁচল ছাড়তে পারে না। অথচ অরুণের ছোট ভাই অশিক্ষিত অতুল কুলিমজুরের কাজে যোগদান করার আগে যন্ত্রণায় ক্ষতবিক্ষত স্বামী-পরিত্যক্ত রমাকে নিয়ে পালিয়েছে। কেউ না বুঝলেও বৈদ্যনাথ বুঝতে পেরেছে প্রীতি আর বিজুর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। জোর করে প্রীতির বিয়ে দিয়েছে। বিজুর প্রীতিহীন জীবন ব্যর্থ বলে মনে হয়েছে। শেষপর্যন্ত সে আত্মহত্যা করেছে। আলোহীন আশাহীন উপন্যাসের পরিণতি যেন মধ্যবিত্তের নিখুঁত বাস্তবজীবনের রূপায়ন।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নন্দী বা নরেন্দ্রনাথ মিত্রের উপন্যাস বা বলা ভালো কথাসাহিত্য অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক বলে আমাদের মনেহয়; যাঁদের লেখায় প্রথম ধরা পড়ে মধ্যবিত্তের স্বপ্নভঙ্গের করুণ আর্তনাদ। অকৃত্রিম আকুতির অনিঃশেষ দীর্ঘশ্বাস। অদূর ভবিষ্যতে প্রত্যাশা রাখি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নন্দী বা নরেন্দ্রনাথ মিত্র পাঠকের প্রদীপে অনির্বাণ শিখায় প্রজ্জ্বলিত হবে। মধ্যবিত্তের মলিন মরম গহন থেকে সেদিন অনুরণিতহবে-- “আমি ক্লান্ত প্রাণ এক”...

.....

স্বাধীনতা উত্তর বাংলা সাহিত্যে সত্যজিৎ রায়ের গোয়েন্দা চলচ্চিত্র 'সোনার কেল্লা' ও 'জয় বাবা ফেলুনাথ'

শ্রীমতী বৈজয়ন্তী মুখোপাধ্যায়

সত্যজিৎ রায় একবার বলেছিলেন যে তিনি সিনেমা তৈরী করে তাঁর জীবনধারণের পক্ষে পর্যাপ্ত উপার্জন করতে পারেন না, কিন্তু তাঁর লেখা বই থেকে তিনি যে রোজগার করেন তাতে তাঁর জীবন স্বচ্ছন্দে কেটে যাবে। অস্কারজয়ী চলচ্চিত্র পরিচালক সত্যজিতের জনপ্রিয়তা গোয়েন্দা গল্পলেখক সত্যজিতের সঙ্গে তুলনা করা যায় না, কিন্তু বাংলায় তাঁর ফেলুদা ওরফে প্রদোষ চন্দ্র মিত্র আর্থার কোনান ডয়েলের শার্লক হোমস কিংবা আগাথা ক্রিস্টির হারকুল পোয়ারোর সঙ্গে একই পঙ্গক্তিতে বসার যোগ্য। লেখক সত্যজিতের ফেলুদা সিরিজের গোয়েন্দা গল্পগুলিকে নিয়ে বিশ্ববিখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ একটি নয়, দুটি চলচ্চিত্র বানিয়েছিলেন- 'সোনার কেল্লা' (১৯৭৪) এবং 'জয় বাবা ফেলুনাথ' (১৯৭৯)। এর থেকেই বোঝা যাচ্ছে গল্পগুলির উৎকর্ষ।

আমার গবেষণাপত্রটি, সত্যজিৎ কীভাবে তাঁর নিজের লেখা উপরোক্ত দুটি বিখ্যাত উপন্যাসকে চলচ্চিত্রায়িত করেছেন এবং এর মাধ্যমে স্বাধীনতা উত্তর গোয়েন্দা চলচ্চিত্রে কালজয়ী বিপ্লব এনেছেন- তারই এক মূল্যায়ন।

এখানে মনে রাখা দরকার 'সোনার কেল্লা' ও 'জয় বাবা ফেলুনাথ' বাদে সত্যজিতের মত ক্যানভাসে বহুরঙে চলচ্চিত্র আঁকা মানুষ আর একটি মাত্র গোয়েন্দাগল্প নিয়ে চলচ্চিত্র বানিয়েছেন- 'চিড়িয়াখানা'- শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প অবলম্বনে। এর থেকেই আমরা বুঝতে পারি 'সোনার কেল্লা' ও 'জয় বাবা ফেলুনাথ ' চলচ্চিত্র দুটি তার কাছে কত প্রিয় ছিল। 'সোনার কেল্লা'-র গল্পটা এইরকম- একটা ছোট্ট ছেলে মুকুলের পূর্বজীবনের কথা মনে আছে যখন সে 'সোনা দিয়ে বানানো' কেল্লায় ছিল। যদিও কেল্লাটি হলুদ স্যান্ডস্টোন দিয়ে তৈরী বলে লোকে মনে করত সোনার তৈরী। মুকুল সেখানে রত্ন মণিমাণিক্য দেখেছিল। ছেলেটির সেই স্মৃতি দুজন অপরাধ জগতের মানুষকে উৎসাহিত করে তাকে কিডন্যাপ করতে। তারা আশা করেছিল্ মুকুল তাদের কোন হারিয়ে যাওয়া গুপ্তধনের সন্ধান দিতে পারবে। এই গল্প যখন সত্যজিৎ চলচ্চিত্রায়িত করেন তখন দর্শক এক শিরদাঁড়া শিরশির করা রহস্যের মুখোমুখি হয়। রাজস্থানের বিভিন্ন লোকেশনে বিভিন্ন টাইপ চরিত্র, কমিক চরিত্র এবং বাংলার বাইরের পৃষ্ঠপট চলচ্চিত্রটিকে জীবন্ত করে তুলেছে।

জয়বাবা ফেলুনাথের গল্প গড়ে উঠেছে বারাণসীকে কেন্দ্র করে। গোয়েন্দা চলচ্চিত্র বাদে এই উপন্যাসে ভন্ড সন্ন্যাসীদের ও ভন্ড ধার্মিকেদের তীব্র সমালোচনা করা হয়েছে । ফেলুদার কথায় 'অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ'।

মুভিটি শুরু হচ্ছে একজন কুমোর দেবীমূর্তি তৈরী করতে করতে ছোট্ট রুকুকে অসুরদের নিধন করার জন্য কীভাবে দেবী দুর্গার সৃষ্টি হয়েছিল – সে গল্প শোনাচ্ছেন।রুকু গল্প শুনতে শুনতে জিজ্ঞাসা করে, 'এগুলো কি সত্যি ?' রুকুর মুখে ফুটে ওঠে সন্দেহ যাকে সত্যজিৎ আরো প্রকট করেছেন রুকুর মুখের চুয়িংগাম দিয়ে – মনে রাখতে হবে চুয়িংগাম এই গল্পের রহস্য ভেদে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। কিন্তু তাদের কথোপকথন বাধা পায় খলনায়ক মগনলাল মেঘরাজের আগমনে। সে একটি হীরের মূর্তির খোঁজে রুকুর পরিবারে এসেছে। এর পরিণামেই ভয়ঙ্কর দুষ্কৃতি মগনলাল মেঘরাজের কাহিনী উঠে আসে। কিন্তু উত্তেজক এ কাহিনীর বাইরেও চলচ্চিত্রটিতে সত্যজিৎ দেখাতে চেয়েছেন কখনো কখনো শিশুদের ভাবনার মধ্যেও সত্যতা লুকিয়ে থাকে যা বড়রা বুঝতে পারেন না এবং তাদেরকে গুরুত্ব ও দেন না। এই সমস্ত ঘটনা এবং মুকল ও রুকুর চিত্রায়ন শিশু মনস্তত্ত্বের ব্যাপারে সত্যজিতের মুন্সিয়ানার পরিচয় দেয়। এই চলচ্চিত্রদুটির মাধ্যমে কতকগুলি শব্দ, যেমন, "মিসটেক", "মগজাস্ত্র", "ভ্যানিশ" ইত্যাদি বাঙ্গালিজীবনের প্রতিদিনের প্রাত্যহিকতায় জায়গা করে নিয়েছে।

.....

উনিশ শতকের বাংলা আখ্যানকাব্যে স্বদেশ-চেতনা

শ্রী মৃন্ময়কুমার মাহাত

সুপ্রাচীন ঐতিহ্য ও সভ্যতার অধিকারী ভারতবর্ষে সুদীর্ঘকাল থেকে শিল্প, সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতির অনুশীলন ও চর্চা হলেও প্রাচীন ও মধ্যযুগে তার কোনো ধারাবাহিক ইতিহাস লিপিবদ্ধ করার চেষ্টা আমরা দেখি না। 'বিনীত মানসিক ভাব ও দেবভক্তি' ছিল আমাদের ইতিহাস রচনার পথে প্রধান বাধা। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজি শিক্ষার সূত্রে পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের সংস্পর্শে এসে শিক্ষিত বাঙালির চিন্তাজগতে এক আমূল পরিবর্তন ঘটে। ফলে তার পূর্বের মানসিকতার বদল ঘটে। দেবতার উপরে স্থান পায় মানুষ। যুক্তিবাদ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের প্রসার ঘটে। ইতিহাস-পুরাণকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার করার ও দেশের অতীত-গৌরবগাথা অনুসন্ধানের চেষ্টা শুরু হয়। বাঙালির মধ্যে জাগ্রত হয় ইতিহাস চেতনা ও স্বদেশ চেতনা। এর ফলে একদিকে যেমন রাজেন্দ্রলাল মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, স্বামী বিবেকানন্দ, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, রজনীকান্ত গুপ্ত, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র মজুমদার, নীহাররঞ্জন রায় প্রমুখের বংলাদেশের বহু পন্ডিত মানুষ ইতিহাস চর্চায় এগিয়ে আসেন; তেমনি এই সময়ের বাংলা আখ্যানকাব্যে স্বদেশপ্রেম হয়ে ওঠে একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রেরণা।

এ-প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মিনী উপাখ্যান' কাব্যটির কথা। দিল্লীর সম্রাট আলাউদ্দিন চিতোররাজ ভীমসিংহের অসামান্য রূপলাবণ্যের অধিকারী পত্নী পদ্মিনীকে অধিকার করার জন্য চিতোর আক্রমণ করেন। এবং চিতোর অধিকার করেন। পদ্মিনী ও রাজপুত নারীরা সতীত্ব রক্ষার জন্য জহরব্রত পালনের মধ্য দিয়ে আত্মাহুতি দেন। এই হল 'পদ্মিনী উপাখ্যান' কাব্যের মূল বিষয়। পদ্মিনীর সতীত্ব ও বীরত্ব-গৌরব এবং আলাউদ্দিনের চিতোর জয় উপলক্ষে রাজপুত জাতির শৌর্য-বীর্য-আত্মত্যাগের উজ্জ্বল বর্ণনা এই কাব্যে প্রাধান্য লাভ করেছে। কর্ণেল টড বিরচিত 'রাজস্থান' গ্রন্থ থেকে এই কাব্যের উপাখ্যানটি নির্বাচন করেছেন।এবং এই গ্রন্থটিকে নির্বাচন করার কারণ হিসেবে তিনি জানিয়েছেন—

"এস্থলে ইহাও জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, আমি এতদ্দেশীয় প্রাচীন পুরাণেতিহাস হইতে কোন উপাখ্যান না লইয়া আধুনিক রাজপুত্রেতিহাস হইতে তাহা গ্রহণ করিলাম ইহার কারণ কি?— এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে পুরাণেতিহাসে বর্ণিত বিবিধ আখ্যান ভারতবর্ষীয় সর্ব্বত্র সকল লোকের কণ্ঠস্থ বলিলেই হয়, বিশেষত ঐ সকল উপাখ্যান মধ্যে অনেক অলৌকিক বর্ণনা থাকাতে অধুনাতন কৃতবিদ্য যুবকদিগের তত্তাবৎ শ্রদ্ধার্হ নহে, এবং এতদ্দেশীয় জনসমাজে বিদ্যা-বৃদ্ধির বান্ধব মহানুভবদিগের মতে তদ্রূপ অদ্ভুত-রসাশ্রিত কাব্য-প্রবাহে ভারতবর্ষীয় যুবকদিগের অত্যুর্ব্বর চিত্তক্ষেত্র প্লাবিত করা কর্ত্তব্য নহে। পরন্তু ভারতবর্ষের স্বাধীনতার অন্তর্দ্ধানকালাবধি বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্তেরই ধারাবাহিক প্রকৃত পুরাবৃত্ত প্রাপ্তব্য। এই নির্দ্দিষ্ট কালমধ্যে এদেশের পূর্ব্বতন উচ্চতম প্রতিভা ও পরাক্রমের যে কিছু ভগ্নাবশেষ, তাহা রাজপুতানা দেশেই ছিল। বীরত্ব, ধীরত্ব, ধার্ম্মিকত্ব প্রভৃতি নানা সদ্‌গুণালঙ্কারে রাজপুতেরা যে রূপ বিমণ্ডিত ছিলেন, তাঁহাদিগের পত্নীগণও সেইরূপ সতীত্ব, বিদূষীত্ব এবং সাহসিকত্বগুণে প্রসিদ্ধ ছিলেন। অতএব স্বদেশীয় লোকের গরিমা-প্রতিপাদ্য পদ্যপাঠে চিত্তাকর্ষণ এবং তদ্দৃষ্টান্তের অনুসরণে প্রবৃত্তি প্রধাবন হয়, এই বিবেচনায় উপস্থিত উপাখ্যান রাজপুত্রেতিহাস অবলম্বনপূর্ব্বক মৎকর্ত্তৃক রচিত হইল।"

অর্থাৎ নিছক সাহিত্যসৃষ্টি নয়, স্বদেশপ্রেমের মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়েই তিনি রাজপুত বীরত্বের ইতিহাসকে তাঁর কাব্যের বিষয় হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। জাতীয়তাবাদের প্রসারে এবং দেশবাশীকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করার ক্ষেত্রে কাব্যটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছিল। বিশেষ করে এই কাব্যের অন্তর্গত 'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে কে বাঁচিতে চায়' অংশটি স্বদেশী আন্দোলনে গায়ত্রীমন্ত্রের স্থান অধিকার করেছিল।

রঙ্গলালের 'কর্মদেবী' 'শূরসুন্দরী', 'কাঞ্চী কাবেরী'; মধুসূদন দত্তের 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য', 'মেঘনাদবধ কাব্য'; হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বীরবাহু' ও 'বৃত্রসংহার কাব্য'; নবীনচন্দ্র সেনের 'পলাশীর যুদ্ধ'; প্যারীশংকর দাশগুপ্তের লেখা 'মহারানা প্রতাপসিংহ' প্রভৃতি আখ্যান কাব্যেও স্বাদেশিকতার চিত্র উজ্জ্বল বর্ণে অঙ্কিত।

জ্যোতির্ময়ী দেবীর 'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা': দেশবিভাগের প্রেক্ষিতে নারীর অবস্থান

ড. সঞ্জয়কুমার ঘোষ

জ্যোতির্ময়ী দেবী বিরচিত 'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা' উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৭৪ বঙ্গাব্দে। দেশবিভাগের বিনিময়ে প্রাপ্ত স্বাধীনতার প্রেক্ষাপটে রচিত এই উপন্যাসটি হয়ে উঠেছে ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গায় স্বজনহারা সুতারার আত্মপ্রতিষ্ঠার কাহিনি। এই উপন্যাসে লেখিকা আমাদের সামনে এক নির্মম সত্য উপস্থাপন করেন - পুরুষের ক্ষমতার প্রতি লোভ দেশ জুড়ে দাঙ্গা বাধায়, ঘটায় অবাধ রক্তপাত। আর তার মূল্য দিতে হয় মেয়েদের, নিজেদের শরীর দিয়ে, সম্মান দিয়ে। দেশভাগ ভারতীয় তথা বাঙালি জীবনে এমন একটি ক্ষত, যার থেকে আজও রক্ত চুয়ে পড়ছে। নিরন্তর দুটি সম্প্রদায়ে হানাহানি, বাস্তুত্যাগ, সীমান্তে লেগে থাকা সমস্যা, গুলিবিনিময়, এমনকি প্রতিবেশীর প্রতি অস্ত্র শানানোর লক্ষে সামরিক খাতে ব্যয়বৃদ্ধি, সবই এই দেশভাগের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ফলাফল।

ভারতীয় উপমহাদেশে দেশভাগের যে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল, তার প্রভাব সবচেয়ে বেশি পড়েছিল পাঞ্জাব ও বাংলায়। যে কোনো অঞ্চলে দাঙ্গার অভিঘাত সবচেয়ে বেশি এসে পড়ে মেয়েদের ওপর। প্রচলিত ধারণা এই যে, কোনো সম্প্রদায়ের মেয়েদের মর্যাদাহানি করতে পারা মানেই সেই সম্প্রদায়ের মেরুদণ্ডে আঘাত করা। মেয়েদের মর্যাদাহানির ঘটনা অধিকাংশ সময় যৌন নির্যাতনের পর্যায়ে পৌঁছোয়। পরাধীন ভারতে কংগ্রেস আর মুসলিম লিগের দ্বন্দ্ব শেষ পর্যন্ত হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় পরিণত হয়েছে, ফলে দেশবিভাগের আগে-পরে ধর্ষণ, হত্যা, লুণ্ঠন অবাধে চলেছে। যে সম্প্রদায়ের যেখানে ক্ষমতা বেশি, সেখানে অন্য সম্প্রদায়ের ওপর তারা নৃশংস নির্যাতন চালিয়েছে। স্বাধীনতা - পরবর্তী কালে পাঞ্জাবে কিছু অপহৃত মেয়ে ফিরে এলেও, বাংলায় সেভাবে অপহৃত মেয়েরা ফিরে আসেনি, তাদের সেভাবে পুনরুদ্ধারের চেষ্টা হয়নি, কেউ কেউ হঠাৎ ফিরে এলেও সমাজে বা পরিবারে প্রাপ্য সম্মান তারা পায়নি। যারা ফিরতে পারেনি, তাদের অবস্থা নিয়েও কেউ চিন্তাভাবনা করেনি। মেয়েরা হল চিরকালের পণ্য। সমাজ তাদের নয় বা তাদের জন্য নয়। তারা সমাজের জন্য।

এইরকমই এক নারী সুতারার আখ্যান এই উপন্যাসে তুলে ধরেছেন জ্যোতির্ময়ী দেবী। তবে দাঙ্গার সময় নির্যাতিত, বিপর্যস্ত সুতারা অধিকাংশ নারীর মতো বিস্মৃতির অন্ধকারে চিরতরে হারিয়ে যায়নি। সে যথার্থ শিক্ষা অর্জন করে, বিড়ম্বিত ভাগ্যকে পরাজিত করে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কারণ জ্যোতির্ময়ী দেবী সবসময় তাঁর লেখায় জীবনের ধনাত্মক দিককেই গুরুত্ব দিয়েছেন, ঋণাত্মক দিককে নয়। কিন্তু স্বাধীনতা-উত্তর পচাত্তর তম বছরে দাড়িয়ে তার 'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা' উপন্যাস হয়ে উঠেছে তৎকালীন সময়ের এক সজীব দলিল, বা বলা যায় এক জীবন্ত ইতিহাস।

……..

দেশভাগের কথকতা : বাঙালি নারীর আত্মকথার আলোকে

ড. সুলগ্না খান

মধ্যরাতে ভারতীয় সংবিধানসভার বিশেষ বৈঠকে ধ্বনিত হয়েছিল জওহরলাল নেহেরু-র সেই দৃষ্টান্তমূলক উচ্চারণ; পৃথিবী যখন নিদ্রামগ্ন, ভারত তখন জাগ্রত এবং স্বাধীন। কিন্তু সে স্বাধীনতা বড়ো সহজে আসেনি। এসেছে দেশভাগজনিত বিপুল ক্ষতিস্বীকারের মধ্য দিয়ে। অর্জিত স্বাধীনতার অন্তরস্থিত কাঁটাতারের বেড়ার ক্ষত; আজও নিরন্তর রক্তাক্ত। স্বাধীনতালাভের মাত্র তেইশ বছরেই পাকিস্তানের গর্ভ থেকে বেরিয়ে আসা স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশের জন্ম, ইতিহাসের এক অমোঘ সত্য। ছিন্নমূলের যন্ত্রণা, বাস্তুহারার হাহাকার; শুধু রাজনীতির অঙ্গনে নয়, স্বাভাবিক ব্যাপ্তিতে গ্রহণ করেছে সাহিত্যের পরিসর-ও। এপার-ওপারের বাটোঁয়ারার এক ঘনসংবদ্ধ জীবনছবি বিভিন্ন সংরূপের পাশাপাশি আত্মকথার আলোকে নিয়েছে সুসংহত রূপ। তবে এক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার, নারী-পুরুষভেদে স্মৃতিকথার বিচিত্রতা-ও কিন্তু কম জটিলতাসম্পন্ন নয়। বদলে যাওয়া আর্থ-সামাজিক ইতিহাস, রাজনৈতিক পটপরিবর্তন, পারিবারিক গড়ন, নবীন মূল্যবোধপ্রসূত সদর-অন্দরেরসংজ্ঞাগত বিশিষ্টতা, কর্মক্ষেত্রের অন্যতর পরিবেশগত উন্মোচন; মেয়েদের জীবন-কে কিছু কম আলোড়িত করেনি। উদ্বাস্তু হয়ে ওঠার আত্যন্তিকতাকে বহন করে

চলা বাঙালি মেয়ে, শিকড়ছেঁড়ার বোধকে নানাভাবে তাঁর চেতনায় সঞ্জীবিত করেছে। সেই চেতনা যেমন বেদনার, তেমন-ই সময়ের নির্মম দলিল-ও বটে।

এই প্রবন্ধ ভাগ হয়ে যাওয়া ভূখণ্ডের দুই পারের জীবনযুদ্ধ-কে বুঝতে চেয়েছে নারীবর্ণিত স্মৃতিচারণার আলেখ্যসূত্রে; নিশ্চিতভাবে কিছু নির্বাচিত আত্মজীবনকথার সাপেক্ষে। আশা-আকাঙ্ক্ষার অবিশ্রান্ত প্রশ্নমালা বাঙালি নারীসত্তার অন্তর্গূঢ় প্রদেশে কীভাবে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে, দেশভাগের বৃহত্তর রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত ব্যক্তি নারীর একক মূল্যায়নে কোন দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিনিধি হয়ে উঠেছে; সুনির্দিষ্ট পরিধিগত সীমায় তার একটি নির্মোহ পর্যবেক্ষণ এই প্রবন্ধের মূল ভরকেন্দ্র হিসেবে বিচার্য হবে।

.....

স্বাধীনোত্তর কালে বামপন্থী রাজনীতির প্রেক্ষিতে গণনাট্য সংঘের সংগঠন ও নাট্যচর্চার ইতিহাস

শ্রী অর্পণ দাস

ভারতীয় গণনাট্য সংঘের আবির্ভাব হয়েছিল বাংলা তথা ভারতবর্ষের ইতিহাসের এক অস্থির সময়ে। ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত গণনাট্য সংঘ দুর্ভিক্ষ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ফ্যাসিবাদের রণহুঙ্কারকে প্রতিহত করে শ্রমিক-কৃষক-সর্বহারার সমানাধিকারের বাণী ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিল। জন্মলগ্নে গণনাট্য সংঘ স্লোগান তুলেছিল, "people's Theatre Stars the People"।যখন বাংলা পেশাদার নাট্যমঞ্চ মানুষের মর্মযন্ত্রণা আর জীবনদ্বন্দ্ব প্রকাশের দায়িত্ব নিতে পারেনি, তখন গণনাট্য সংঘ বলিষ্ঠ মতাদর্শ দিয়ে বাঙালির 'মূঢ় ম্লান মূক' মুখে ভাষা জুগিয়েছিল। 'জবানবন্দী', 'নবান্ন', 'শহীদের ডাক' প্রভৃতি প্রযোজনার মাধ্যমে গণনাট্য মানুষের মনে যেমন আশা জাগিয়েছিল, তেমনই এক ভিন্নধারার নাট্য-আন্দোলন গড়ে তুলতে সফল হয়েছিল।

গণনাট্য সংঘ সরাসরি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির অংশ না হলেও আদর্শগত সাযুজ্যের জন্য পার্টি নীতির প্রভাব পড়েছিল। গণনাট্য সংঘের প্রতিষ্ঠা ও সর্বভারতীয় সংগঠনের বিকাশের সঙ্গে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির তৎকালীন সম্পাদক পি সি যোশী ওতপ্রোত ভাবে জড়িত ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন ভালো নাট্যপ্রযোজনার মাধ্যমে সমাজতান্ত্রিক চেতনা গড়ে তোলা সম্ভব। ১৯৪৫-এ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি ও ১৯৪৬-এ ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গার পর ১৯৪৭-এর ১৫ আগস্ট ভারতবর্ষ দ্বিখণ্ডিত ভাবে স্বাধীন হয়। নতুন দেশ, নতুন আশা। কিন্তু ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির নীতির ফলে গণনাট্যের সংগঠন ও নাট্যচর্চায় আমূল পরিবর্তন আসে। যার প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী।

১৯৪৮-এর ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ৬ মার্চ কলকাতার মহম্মদ আলি পার্কে কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। পি সি যোশীর পরিবর্তে সাধারণ সম্পাদক হন বি টি রণদিভে। তার সঙ্গে বদলানো হয় পার্টি-লাইন। নতুন কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকেবলা হয়'ইয়ে আজাদি ঝুটা হ্যায়'। কারণ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির স্বার্থকে সুরক্ষিত করার জন্য শুধুমাত্র শাসনক্ষমতার মালিকানা বদল হয়েছে। দেশের বর্তমান নেতৃত্ব আদতে পুঁজিপতি ও জমিদারদের প্রহরী। সম্মেলনে যোশীবাদী উদার ও সমন্বয়বাদীনীতির কঠোর সমালোচনা করা হয়।বলা হয় যোশীর নেতৃত্বে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে পেটি বুর্জোয়া মতধারার প্রবেশ ঘটেছিল। ফলেপ্রকৃত মার্কসবাদের ধারায় শ্রমিকশ্রেণিকে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের জন্য ডাক দেওয়া হয়নি। রণদিভে প্রবর্তিত নতুন রাজনৈতিক লাইনে ক্ষমতা দখলের বিপ্লবে শ্রমিকরাই থাকবেন মূল নেতৃত্বে। আর কৃষক আন্দোলনের ক্ষেত্রে তেলেঙ্গানার মত মুক্তাঞ্চল তৈরির পথই হবে সত্যিকারের পথ। ১৯৪৯-এর অক্টোবরে পশ্চিমবঙ্গের প্রাদেশিক সংগঠনী কমিটির একটি রিপোর্টে জানানো হয় শান্তিপূর্ণ অহিংসার পথ এখন আর অবশিষ্ট নেই, তাই গৃহযুদ্ধ (সিভিল ওয়ার) চালিয়ে শ্রেণি-সংগ্রামকে খুব উঁচু পর্দায় নিয়ে যেতে হবে। ১৯৪৮-এ দ্বিতীয় কংগ্রেসের কদিন পরেই ২৬ মার্চ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। শুরু হয় ব্যাপক ধরপাকড় ও অত্যাচার।

১৯৪৯-এ অক্টোবর মাসে মাও-জে-দং নেতৃত্বে চিনের বিপ্লব সমাপ্ত হয়। যার প্রভাবে এদেশেও ধ্বনি ওঠে'চিনের মতো ক্ষমতা দখল' করো। এই সময়ে দ্বিতীয় পর্বের তেভাগা আন্দোলন ক্রমে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের সশস্ত্র সংগ্রামের রূপ নেয়। দক্ষিণ ভারতের তেলেঙ্গানার মত করে কাকদ্বীপ-সোনারপুর-লালগঞ্জ-চন্দনপিঁড়ি প্রভৃতি স্থান বাংলার কৃষকরা 'মুক্তাঞ্চল'-এ পরিণত করেছিল। কিন্তু সেনাবাহিনীর অস্ত্রের কাছে তাঁরা হার মানতে বাধ্য হন। যদিও কৃষক রমণী গর্ভবতী অহল্যা বা

সরোজিনী-বাতাসী-উত্তমীর রক্তের দাগ বাংলার মাটি থেকে কোনোদিন শুকিয়ে যায়নি। তাছাড়া কলকাতা ও শহরতলী অঞ্চলে শ্রমিক আন্দোলন-ধর্মঘট-গুলি চালনা-লাঠি চার্জ তখন নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে উঠেছিল।

সিপিআই-এর তৎকালীন নীতির প্রভাব বাংলার বামমনস্ক সাংস্কৃতিক মহলের একাংশের মধ্যেও তীব্র মতবিরোধ সৃষ্টি হয়। প্রকৃত সংগ্রামী সাহিত্যের রূপ ও তার কর্তব্য নিয়ে বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে মতান্তর ক্রমে মনান্তরে পরিণত হয়। ভারতীয় গণনাট্য সংঘে তখন অবিশ্বাসের কাল। রণদিভের নীতি ও বুদ্ধিজীবীদের মতপার্থক্য গণনাট্য সংঘকে গ্রাস করতে শুরু করেছিল। পার্টি-লাইন অনুসারে চিন্মোহন সেহানবীশের মত ছিল গণশিল্পীদের সবাইকে সৈনিক হয়ে আগে ফ্রন্টে যেতে হবে। তাতে নতুন শিল্পসৃষ্টি না হলেও অসুবিধা নেই। 'লোকনাট্য' পত্রিকায় মৃত্যুঞ্জয় অধিকারী ছদ্মনামে সজল রায়চৌধুরী লিখলেন মেকি জাঁকজমক ও আঙ্গিকের বুলিকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে গণনাট্য এতদিন শ্রমিক-কৃষকের কাছে পৌঁছোয়নি। তাই পার্টি লাইনের প্রতি আনুগত্যই গণনাট্যের শিল্পী হয়ে ওঠার শেষ কথা। কমিউনিস্ট পার্টির বে-আইনি ইস্তেহার ট্রামে বাসে বিলোতে না পারলে কোনো শিল্পীকেই গণনাট্যের একজন বলে গণ্য করা হবে না।

১৯৪৯-এর ফেব্রুয়ারি মাসে এলাহাবাদে গণনাট্য সংঘের ষষ্ঠ সর্বভারতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। নতুন সভাপতি নির্বাচিত হন মহারাষ্ট্রের মজদুর কবি আন্নাভাই শাঠে এবং সাধারণ সম্পাদক হন নিরঞ্জন সেন। সম্মেলনে বর্তমান পার্টি লাইনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বলা হয় গণনাট্য সংঘের নাট্যচর্চা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পথ ধরে কৃষক-মজুরের মধ্যে গিয়ে সংগ্রামী বার্তা প্রচার করবে। 'জঙ্গি-মজুর' ও কৃষক-আন্দোলনের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে সংঘের প্রাথমিক ইউনিট গড়ে উঠবে, তাঁদের প্রতিনিধি দ্বারা উচ্চস্তরের কমিটিগুলি গঠন করা হবে। সংঘের প্রত্যেক কর্মীকে সংগ্রামী আন্দোলনের সাংস্কৃতিক সৈনিক হওয়ার পাশাপাশি বৃহত্তর গণ-আন্দোলনের সৈনিক হয়ে উঠতে হবে। অর্থাৎ "ধানের ক্ষেতে ফুল ফোটালে চলবে না। ধান বুনতে হবে।" কিন্তু গণনাট্য কীভাবে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সামন্তবাদ-বিরোধী সাংস্কৃতিক গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গড়ে তুলবে, সে বিষয়ে কোনো আলোচনা হয়নি। সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতি গড়ে তুলতে গিয়ে গণতান্ত্রিক শিল্পীদের সন্দেহের চোখে দেখা শুরু হয়। গণনাট্যের ওই সময়ের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে ঋত্বিক ঘটকের মন্তব্য,-- "কাল্পনিক বিপ্লবের আপাতবাস্তবের উপর জোর দিয়া সে শিল্প সুলভ আঙ্গিককে অবজ্ঞা করিল, ফলে শিল্প আর শিল্প রহিল না, জিগিরে পরিণত হইল।"

.....

ইতিহাস স্মরণে বাংলা সাহিত্য

পাঁচের দশকের বাংলা কবিতায় স্বাধীনতা-প্রসঙ্গ

শ্রী ইন্দ্রজিৎ ঘোষ

একশ নব্বই বছরের পরাধীনতার গ্লানি কাটিয়ে ১৯৪৭-এর দ্বিখণ্ডিত স্বাধীনতা দেশবাসীর মনে উন্মাদনা তৈরি করেছিল। স্বাধীনতার আশায় দীর্ঘদিন কাটানো মানুষের বেশিরভাগই ৪৭-এর ১৫ আগস্টের আগে স্ব+অধীনতা-কে লালন করে, মনের কোণে উচ্চাশা পোষণ করতেন। তাদের ধারণা ছিল স্বাধীনতা দেশের যাবতীয় সমস্যা দূর করে নতুন ভারতবর্ষ তৈরি করবে। কিন্তু অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই স্বাধীন ভারতের প্রকৃত স্বরূপ ফুটে উঠল। কিছু মানুষ স্বাধীনতা নিয়ে আশাবাদী হলেও অনেকের কাছেই স্বাধীনতার নামান্তর হল ক্ষমতার হস্তান্তরীকরণ। তবে সমস্ত বিতর্কের ঊর্দ্ধে উঠে স্বাধীনতা বাংলাকবিতা তথা সাহিত্যের আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে দিল।

বাংলা কবিতা বিকাশের ধারায় নজর দিলে দেখা যাবে সামাজিক ও আত্মজৈবনিক দুটি ধারা আধুনিক বাংলাকবিতার শুরু থেকেই চলে আসছে। চল্লিশের সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে কবিতার সামাজিক তথা রাজনৈতিক ধারার বিকাশ যতটা হয়েছিল, ঠিক তার বিপরীতে গিয়ে আত্মমুখী কবিতার বিকাশ ততটা ঘটেনি। আবার পঞ্চাশে এসে ঠিক এর বিপরীত পরিস্থিতি দেখা দিল। তবে দুই দশকের কবিতা ধারায় পরিবর্তন বিশেষ না ঘটলেও বদল ঘটে যায় কবিতার বিষয়ে। স্বাধীনতা পরবর্তীতে সামাজিক তথা রাজনৈতিক কবিতার বিষয়ের পরিবর্তন অনিবার্য ছিল। কারণ রাজনৈতিক কবিতা বিষয়ের বেশি অংশ জুড়েই থাকে শাসকের বিরোধিতা। ১৯৪৭-এ শাসকের পরিবর্তনের পর রাজনৈতিক কবিতাকে আর দেশাত্মবোধক হিসাবে চিহ্নিত করা হল না। দেশাত্মবোধের কবিতা অর্থের সংকোচন ঘটিয়ে রাজনৈতিক আবরণ গায়ে তুলে নেয়। আর রাজনৈতিক কবিতা তথা

মানুষের কথা বলা কবিদের রাজনৈতিক পরিচয় খোঁজার চেষ্টা শুরু হয়। স্বাধীনতা পরে বাংলাকবিতার রাজনৈতিক ধারায় সবচেয়ে বড় পাওয়া সরকারের বা শাসকের সমর্থনে লেখা কবিতা। যেটি স্বাধীনতার আগে আধুনিক কবিতায় পাওয়া যায় না। তবে স্বাধীনতা আধুনিক কবিতা ধারার সবচেয়ে বড় পরিবর্তন ঘটায় আত্মমুখী কবিতার ক্ষেত্রে। পঞ্চাশের দশকে নিজেদের সাহিত্যিক জীবন শুরু করা কবিদের বেশিরভাগই তাদের কৈশোর অতিবাহিত করেছিলেন চল্লিশের সামাজিক অস্থিরতায়। জীবনের অনিশ্চয়তা, হতাশা, উদ্বাস্তু হয়ে দেশত্যাগের মধ্যে দিয়ে ঐ সমস্ত ভাবী সাহিত্যিকদের যৌবনত্ব প্রাপ্তি। তারুণ্যের তেজে বলীয়ান হতে তারা হতাশাকে কাটাতে চেয়েছিলেন সাহিত্যের অঙ্গনে এসে। তারা চল্লিশের উদ্দেশ্যমূলক আধুনিকতার বিরুদ্ধে গিয়ে সাহিত্যকে লক্ষ্য বর্জিত করার ডাক দিলেন 'কবিতার জন্য কবিতা' শব্দবন্ধের মধ্যে দিয়ে। একই সঙ্গে বয়সজনিতকারণে পঞ্চাশের কবিদের কাছে পরাধীনতার গ্লানি আবেগ হয়ে না থাকায় তারা স্বাধীনতায় খুব বেশি উচ্ছ্বাস দেখাননি। ফলস্বরূপ বাংলাকবিতার দিক বদল ঘটে যায়।

.....

শচীন দাশের উপন্যাসে দেশভাগঃ জ্বলন্ত সময়ের দলিল

জহিরুল রহমান মণ্ডল

শচীন দাশ (১৯৫০ – ২০১৬ খ্রিঃ) বাংলা সাহিত্যের একজন বিশিষ্ট ঔপন্যাসিক । তাঁকে শুধুমাত্র ঔপন্যাসিক বললে ভুল হবে, তিনি একইসঙ্গে ছোটগল্পকার, প্রাবন্ধিক এবং গ্রন্থ সমালোচক। আধুনিক সমাজের নানা সমস্যা যেমন নারী পাচার, হিন্দু – মুসলিম সম্পর্ক, সর্বোপরি সুন্দরবনের মানুষগুলির একটা চেনা সুস্পষ্ট চিত্র তাঁর উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে উঠে আসে । তবে আর একটি বিষয় শচীন দাশের উপন্যাসকে সমৃদ্ধ করেছে, তার নাম হল দেশভাগ। দেশভাগ নিয়ে তাঁর উপন্যাসের সংখ্যা চারটি হলেও সেখানে দেশভাগের ভয়ঙ্কর পরিণতিগুলিকে সুন্দরভাবে দেখানো হয়েছে। দেশভাগ, এই চারটি শব্দবন্ধের একদিকে আছে খুশির উল্লাস, আশা–আকাঙ্ক্ষার স্বপ্নপূরণ, দীর্ঘদিনের প্রতীক্ষার অবসান আর অন্যদিকে আছে দুঃখের সুমদ্র। কোটি-কোটি মানুষের হাসির বিপরীতে আছে কোটি-কোটি মানুষের কান্না। দেশভাগের প্রতিক্রিয়ায় বীভৎস হত্যা, রক্তপাত, লক্ষ-লক্ষ মানুষের ভিটে মাটি হারানো, শত-শত নারীর লাঞ্ছনা ইত্যাদি নারকীয় ঘটনা মানুষের জীবনে তৈরি করেছে এক দীর্ঘস্থায়ী ক্ষত। এই দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতকে অন্যান্য বিভিন্ন ঔপন্যাসিক যেমন– অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, নারায়ণ সান্যাল, প্রফুল্ল রায়, জ্যোতির্ময়ী দেবী এবং সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো উপন্যাসের পাতায় স্থান দিলেন শচীন দাশ। লেখক নিজেই ছিলেন ভিটে–মাটি হারানো ছিন্নমূল মানুষ। তাই তাঁর লেখনীর মধ্যে দেশভাগের যে ছবি উঠে এসেছে তা প্রত্যক্ষত বাস্তব জীবনের ছবি। শচীন দাশের উপন্যাসে দেশভাগের ছবি আলোচনা করার পূর্বে তাঁর 'আমার উদ্বাস্তু জীবন' প্রবন্ধটির আলোচনা জরুরি। লেখকের দেশভাগ সংক্রান্ত দৃষ্টিকোণকে বুঝতে গেলে এই প্রবন্ধটির গুরুত্ব অপরিসীম। শচীন দাশ লিখছেন– "দেশভাগের পর থেকেই ভয় দেখানো হচ্ছিল হিন্দুদের। আমরাও তা থেকে বাদ যায়নি। ফলে পঞ্চাশের দাঙ্গা শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেসব আর উপেক্ষা করা গেল না। দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়েছিল বরিশাল, ঢাকা, ফরিদপুর, চট্টগ্রাম, সিলেট, নোয়াখালি, কুমিল্লা, দিনাজপুর ও রংপুর থেকে সমস্ত জায়গায়। পূর্ববঙ্গের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে। বাড়ি-ঘরে আগুন লাগিয়ে আমার সেজো কাকাকে হত্যা করে আমাদের বাধ্য করা হল বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে। জেঠা, বাবা ও আমার অপর দুই কাকা তাদের পুরো পরিবার নিয়ে পালিয়ে আশ্রয় নিল কাছাকাছি এক পাটখেতের ভেতরে। সেখানে একটা রাত কাটিয়ে পরেরদিন ভোরে কী করে নদীর পাড়ে এসে এক মাঝিকে রাজি করিয়ে বিকেলের দিকে গোয়ালন্দে এসে উঠল– সে এক ভয়াবহ অভিজ্ঞতা"। এই অভিজ্ঞতাকে পাথেয় করে শচীন দাশ একের পর এক লিখলেন তাঁর দেশভাগের উপন্যাস ।

শচীন দাশের দেশভাগ সংক্রান্ত উপন্যাসগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল– 'আগুনের দিন' (১৯৯৭), 'উদ্বাস্তু নগরীর চাঁদ' (২০০৮), 'বর্ডার' (২০১০), 'লাশ ভাইস্যা যায়' (২০১৪) এবং 'এক পয়সার ট্রাম' (২০১৬) ।

তিলোত্তমা মজুমদারের উপন্যাস: স্বাধীনতা-উত্তর দেশচেতনার বিবর্তন

শ্রীমতী দীপিকা বাড়ই

বিশ শতকের নব্বইয়ের দশকের অন্যতম কথাসাহিত্যিক তিলোত্তমা মজুমদার (১৯৬৬, ১১ই জানুয়ারি -)। তাঁর রচিত উপন্যাস মানবজীবন ও সমাজ কথার বিচিত্র উপাদান নিয়ে বাংলা সাহিত্যে যেমন অনন্য ভুবন রচনা করেছে তেমনি হয়ে উঠেছে স্বাধীনতা-উত্তর সমাজ পরিবেশে দেশচেতনার বিবর্তনের জীবন্ত, ভিন্নমুখী কথাভাষ্য। এই বিষয় সম্পর্কিত আমাদের নির্বাচিত উপন্যাসগুলির ('ঋ', 'মানুষ শাবকের কথা', 'জর্মের চোখ', 'স্বর্গের শেষপ্রান্তে') প্রেক্ষাপট হিসাবে রয়েছে উত্তরবঙ্গের চা-বাগান, বন-জঙ্গল পরিবিধৃত ডুয়ার্স অঞ্চল। উপন্যাসগুলির চরিত্রেরা বেশিরভাগ দেশের বিভিন্ন স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দিয়েছে এবং দেশভাগের ফলে এই অঞ্চলে এসে বসবাস শুরু করেছে। ফলে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সময়ে বদলে যাওয়া সমাজব্যবস্থা, জীবনসংগ্রাম তারা অনুভব ও উপলব্ধি করেছে। তারা ইতিহাস, সময়ের সাক্ষী যেমন থেকেছে তেমনি বদলে যাওয়া চেতনার, জীবনবোধের দলিল হয়েছে। উপন্যাসগুলি পড়ে যে দিকগুলি আমাকে বড় আকর্ষণ করেছে, তা হল-

(১) চরিত্রদের 'দেশ' সম্পর্কে ধারণা পাল্টে যাচ্ছে। এই 'দেশ' অখণ্ড 'ভারতবর্ষ'ই নয় বরং প্রত্যেক মানুষের স্বদেশ সম্পর্কে নিজস্ব জগতের গড়ে ওঠা ধারণা। দেশ মানে জন্মভূমি। দেশ মানে বংশানুক্রমিক বসবাসের সঙ্গে মাটির ঘন সম্পর্ক। আটপৌঢ়ে জীবনে চরিত্রেরা অনুভব করেছে তাঁদের দেশ খণ্ডিত, আঞ্চলিক। তাই তা বুখলা ক্ষেত্রে মানভূম বা রাঁচি, সুপূর্ণার ক্ষেত্রে বলসিংপাড়া, সরোজিনীর ক্ষেত্রে দেশ মানে পূর্ববঙ্গের দুটি গ্রাম- কুমিল্লার মোল্লাপাড়া, অন্যটি ঢাকার খিলতোলা। আবার চম্পাবতীর বিশ্বাসে কোনও একখানে মাটির প্রতি টান থাকতে নেই। সব মাটিই আমার, সব মাটিই আপন। অথচ এরই মাঝে গড়ে ওঠে দেশ, মহাদেশ, জাতি, বর্ণের জটিল তত্ত্ব। দেশ হারা হয়ে মানুষ হয়ে পড়ে বিষন্ন, ছন্দোহীন। ব্রিটিশ ভারত ও ব্রিটিশমুক্ত বর্তমান ভারতে থেকেই চরিত্রেরা 'দেশ' কে উপলব্ধি করেছে নানাভাবে।

(২) ব্রিটিশ শক্তি এদেশে আর নেই। কিন্তু এখনও মালিক-শ্রমিক শোষণ জারি রয়েছে। চা-বাগানের প্রেক্ষাপটে গড়ে ওঠা এই উপন্যাসগুলি স্বাধীনতা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সময়ের পরিবর্তিত এই শোষণের চিত্র তুলে ধরেছে। এখনকার মালিকেরা শ্রমিককে 'হাতে মারে না, ভাতে মারে'। ব্রিটিশ নেই কিন্তু এখনও রয়েছে তাদের তৈরী বিভেদনীতি। যার কারণেই আদিবাসীদের চাইতে নেপালীরা নিজেদের শ্রেষ্ঠ মনে করে, বাঙালি বাবুরা নেপালীদের চাইতে আদিবাসীদের নিকৃষ্ট মনে করে। অথচ আদিবাসীরা তা নিয়ে মাথা ঘামায় না।

(৩) স্বাধীনতা-উত্তর দেশচেতনার অন্যতম বিবর্তিত দিক নির্দেশ করে ব্যক্তিত্বের উপলব্ধি। চরিত্রেরা অন্যের দ্বারা বা কোন প্রচলিত প্রথা অনুশাসন দ্বারা নিজেকে বা নিজেদের শোষিত মনে করলেও তার পেছনে রয়েছে বন্ধন থেকে মুক্তির মনস্কামনা। অথবা যুক্তির নিরিখে নিজস্ব স্বাধীন সত্ত্বার উপলব্ধির দিক।

এছাড়াও রচনাগুলিতে স্বাধীনতা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সময়পর্বের পরিবেশ-পরিস্থিতি চিত্রনে, জীবনসংগ্রামের বর্ণনায়, বাস্তবতার দর্শনে আমার এই প্রবন্ধ রচনার অনুপ্রেরণা হয়ে উঠেছে।

.....

স্বাধীনতার ইতিহাস স্মরণে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ধাত্রীদেবতা'

শ্রী প্রসেনজিৎ রায়

স্বাধীনতা লাভ একদিকে যেমন আনন্দের অপর দিকে ঠিক বেদনার। আনন্দের কারণ পরাধীনতার গ্লানি থেকে আপাতভাবে দেশ মুক্তি পেল; কিন্তু একইসঙ্গে দেশটা ভাগ হয়ে গেল। বাংলার সংস্কৃতি আরও যেন ক্ষুদ্র হয়ে গেল। স্বাধীনতা প্রাপ্তির এক দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। এই ইতিহাসকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন লেখক নিজের মতো করে দেখতে এবং দেখাতে চেষ্টা করেছেন। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় স্বাধীনতা আন্দোলন ও দেশভাগকে সরাসরি প্রত্যক্ষ করেছিলেন। স্বাধীনতার এই ইতিহাসকে বিভিন্ন লেখায় তুলে ধরেছেন। 'ধাত্রীদেবতা' উপন্যাসটির কথা এপ্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। উপন্যাসে শিবনাথ আসলে একজন

সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মী। উপন্যাসের প্রথম থেকেই ঔপন্যাসিক তাকে একটু ভিন্নভাবে এঁকেছেন। ধনুকে জ্যা দেওয়া থেকে শুরু করে ক্যাসাবিয়াঙ্কের কাব্য পাঠ, ছেলেদের সঙ্গে মারামারি করা, মায়ের কাছ থেকে 'আনন্দমঠের' পাঠ শুনে উদ্বুদ্ধ হওয়া ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে শিবনাথ বেড়ে উঠছে। দেশের বাস্তব পরিস্থিতির মুখোমুখি হয় বিশেষ করে ২৭ নং পরিচ্ছেদে যেখানে এক অনাহার ক্লিষ্ট মেয়ে ও বৃদ্ধা তার কাছে আসে ভিক্ষা চাইতে, তখন মনে পড়ে 'আনন্দমঠের' কথা 'মা যা হইয়াছেন'। তবে সেখানেই থেমে থাকেনি সে জানতে চায় সেই মন্ত্রকে যার দ্বারা 'মা যা হবেন'। এরপর গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের মতো শিবনাথ, সুশীল ও পূর্ণ নেমে দেশমাতার সেবায়, যোগ দেয় সন্ত্রাসবাদে। কেননা তাদের মতে স্বাধীনতা পায়ে হেঁটে চলে আসবে না, তার জন্য দেশের মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে।

.....

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে স্বাধীনতা উত্তর আদিবাসী সমাজ

শ্রীমতী বিন্দারণা দত্ত

বাংলা সাহিত্যের ধারায় শরৎচন্দ্র-বিভূতিভূষণের পরবর্তী কালে যে সমস্ত সৃজনশীল লেখক তাঁদের উপন্যাসে জঙ্গল-নদী-পাহাড়-ঋতুবৈচিত্র্য তথা স্বাভাবিক প্রকৃতি জগতের মাটি- মানুষ, জীবন- জীবিকা, বাঁচার সংগ্রাম তথা আদিম সমাজ-সংস্কৃতি-ঐতিহ্য-ইতিহাস রূপান্তর নিয়ে নিরবিচ্ছিন্নভাবে নানাবিধ চর্চা করে চলেছেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম বরিষ্ঠ সাহিত্যিক হলেন তপন বন্দ্যোপাধ্যায়। তপন বন্দ্যোপাধ্যায় বিরচিত আদিবাসীকেন্দ্রিক বিখ্যাত উপন্যাসগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাস হল 'মহুলবনীর সেরেঞ'। সুবর্ণরেখা তীরবর্তী ঝাড়খণ্ড-মেদিনীপুর অরণ্য অঞ্চলের মহুলবনী গ্রামকে কেন্দ্র করে উপন্যাসটির পটভূমি রচিত হয়েছে। মহুলবনী মূলত সাঁওতাল প্রধান গাঁ। সাঁওতালরা তাদের কৌম সমাজ-সংস্কৃতিকে কোনোভাবেই বিকৃত হতে দিতে চায় না। কিন্তু সভ্যতার আলোক ছটা এসে পড়ে তাদের সংস্কৃতির ওপর। স্বাধীনতা উত্তর সমাজ ব্যবস্থায় অনেক সাঁওতাল যুবক ইংরাজি ভাষায় পারদর্শী। গ্রামের প্রাচীনপন্থী মানুষরা অনেকেই শিক্ষার বিরোধী, এমনকি যেকোনো অসুখের চিকিৎসার জন্য তারা এখনও ওঝার ওপরই নির্ভরশীল। কিন্তু ইংরাজি শিক্ষায় শিক্ষিত যুবক শ্রেণি সমাজের পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে ডাক্তারের আউটডোর তৈরি করে গাঁয়ের ক্লাবঘরে।

তপন বন্দ্যোপাধ্যায় 'দ্বৈরথ' উপন্যাসেও আদিবাসী জাতির উত্থানকে স্পষ্ট দেখিয়েছেন। আদিবাসী মেয়ে পান্না কোটাল সমস্ত দেশের কাছে বিস্ময়কর প্রতিভা। শুধুমাত্র পান্নাই নয়, অনেক আদিবাসী ছেলে-মেয়েই বিদ্যাচর্চায় অগ্রসর হয়েছে। লালতাকুঁড়ি গাঁয়ের সাঁওতালরা রাজাবাবুকে দেবতা জ্ঞানে সম্মান ও শ্রদ্ধা করলেও শেষপর্যন্ত পার্টির দ্বারস্থ হয়েছে। তারা বুঝেছে মুখ বুজে মার খাওয়ার দিন ফুরিয়ে গেছে। এই একই সুর শুনতে পাওয়া যায় 'নদী-মাটি-অরণ্য' উপন্যাসে ১৫ নম্বর লাটের পূবের কাছারিতে মুনিষ খাটতে আসা আদিবাসীদের মধ্যেও।

আদিবাসী জনগোষ্ঠী নিজেদের রীতি-নীতি সংস্কারের ব্যাপারে রক্ষণশীল। কিন্তু 'মহুলবনীর সেরেঞ' উপন্যাসে আমরা দেখতে পাই বাহা পরবের মতো গুরুত্বপূর্ণ পরবে 'দেকো' হওয়া সত্ত্বেও ডাক্তার অলক্তককে নিমন্ত্রণ করে অতিথি হিসাবে যথেষ্ট খাতির করেছে গ্রামবাসীগণ। কিন্তু পরজান বুড়োর মতো প্রাচীনপন্থী মানুষরা আধুনিকতা তথা সভ্যতার বাহক হিসাবে ডাক্তারবাবুকে অপমান করতেও পিছপা হয় না। গাঁয়ের যেকোনো বিচারের জন্য 'কুলহি'-ই শেষ কথা। কিন্তু বর্তমানে আদিবাসীরা পুলিশ তথা পঞ্চায়েতের যেমন দ্বারস্থ হয়, তেমনি আবার কখনো কখনো তারা কোর্ট এমনকি এসডিও অফিসেরও বিচারাধীন হয়।

ঔপন্যাসিক তাঁর উপন্যাসগুলিতে আদিবাসী সমাজের নানা খুঁটিনাটি দেখানোর পাশাপাশি সমাজের বহুমাত্রিক রূপান্তরকেও দেখিয়েছেন। এজন্যই তাঁর জঙ্গলকেন্দ্রিক উপন্যাসগুলি বহুল পরিমাণে আকর্ষণীয়।

“দোজখনামা”- দুই কথক চরিত্রের জবানিতে “স্বাধীনতা”

শ্রীমতী সুকন্যা চতুর্বেদী

আজকের দিনে দাঁড়িয়ে “স্বাধীনতা” শব্দটির গুরুত্ব আমাদের কাছে কয়েকগুণ বেশি অর্থবহ হয়ে উঠেছে। “স্বাধীনতা” শব্দটির আভিধানিক অর্থ “স্ব-অধীনতা” হলেও ক্ষেত্রবিশেষে তা পাল্টে যায়। সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রের স্বাধীনতা আর ব্যক্তিস্বাধীনতা স্পষ্টতই আলাদা। আলোচনার শিরোনামে স্বাধীনতা ৭৫ অর্থাৎ ভারতবর্ষের স্বাধীনতাকে সামনে রেখে ইতিহাস এবং সাহিত্যের মেলবন্ধনের প্রয়াস আমরা করব। ১৯৪৭-র স্বাধীনতার পেছনের দীর্ঘ ইতিহাস আছে এবং সেই ইতিহাস শুধুমাত্র যে রাজনৈতিক নয়, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার প্রভাব তৎকালীন সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি সর্বোপরি ব্যক্তিমানসকে যথেষ্ট আলোড়িত ও প্রভাবিত করেছিল। দীর্ঘ প্রায় দু’শো বছরের ইংরেজ শাসনের অবসান এবং দেশভাগের বিনিময়ে স্বাধীনতা– একই সাথে এনে দিয়েছিল মুক্তি ও বিচ্ছেদের যন্ত্রণার এক দ্বৈত অনুভূতি।

৪৭-র স্বাধীনতা আমাদের কাছে “ব্রিটিশ অধীনতা মুক্ত ভারত” এনে দিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু প্রকৃত অর্থে এই স্বাধীনতা ছিল ভগ্নস্বাধীনতা। সেই মুক্তিতে অখণ্ডতার স্বাদ বা স্থান কোনটাই ছিল না। আমরা এখন যেই স্বাধীনতা নিয়ে এত আলোচনা করছি, সে তো ইংরেজদের হাত থেকে অর্থাৎ ব্রিটিশ অধীনতা থেকে মুক্তির কথা; কিন্তু ভারতে ইংরেজ শাসনের পূর্বেরও তো এক দীর্ঘ ইতিহাস আছে, বলা বাহুল্য তাকে বাদ রেখে এই আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। ইংরেজ শাসনের পূর্বেও এদেশে মোঘল, পাঠানসহ একাধিক বিদেশীদের অনুশাসন ছিল। একই সাথে ছিল ধর্মীয় অনুশাসন এবং বলা বাহুল্য এই প্রত্যেক যুগেই জনগণ অর্থাৎ প্রজারা কারো না কারো অধীনেই ছিল। কিন্তু সে যুগে “ব্যক্তিস্বাধীনতা” শব্দটি তখনও মানব-ইতিহাসে ঠাঁই পায়নি। মূলত এই ব্যক্তিসত্তার বিকাশের সাথে সাথেই স্বাধীনতা শব্দটি নতুন করে ইতিহাসে এক অধ্যায়ের সূচনা করল।

আমি আজকের আলোচনার বিষয় হিসাবে ঔপন্যাসিক- লেখক রবিশংকর বল-এর “দোজখনামা” উপন্যাসটিকে বেছে নিয়েছি। মির্জাগালিব ও সাদাত হোসেন মান্টোর জবানিতে ঔপন্যাসিক গোটা উপন্যাসটিকে সাজিয়েছেন। পুরো উপন্যাসটি আপাতভাবে তিনটি পর্যায় বা বিভাগ। মুখ্য বিষয়ের কিসসা উপন্যাসের দুই চরিত্রকে কেন্দ্র করে। পাশাপাশি এই কিসসা শোনাতে অর্থাৎ পাঠক পর্যন্ত পৌঁছোতে সাহায্য করেছেন কথক এবং তবসুম। উপন্যাসে মান্টোর জবানিতে যে অংশটি রয়েছে, তাতে দেশভাগ-সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার যে ছবি ফুটে উঠেছে; বাস্তবে তা তৎকালীন সময়ের দলিল, ইতিহাসের দলিল। অন্যদিকে মির্জা সাহেবের কাছে স্বাধীনতা সম্পূর্ণ অন্য এক অর্থে দেখা দিয়েছে। এই দুইয়ের মেলবন্ধনের কাহিনি আমার আলোচনার উপজীব্য।

.....

১৯৯২-এর কলকাতার দাঙ্গা ও আফসার আমেদের ‘ব্যথা খুঁজে আনা’ উপন্যাস

শ্রীমতী সোনালী দাস

মহানগর কলকাতার সঙ্গে দাঙ্গা শব্দটির যোগ নূতন নয়। আমাদের তিলোত্তমা কলকাতা সংস্কৃতির পীঠস্থান হলেও দাঙ্গার গর্ভগৃহ হয়ে উঠেছে বারবার। ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দেই কলকাতায় প্রথম হিন্দু=মুসলমান দুই সম্প্রদায় পরস্পরের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল। ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দের দাঙ্গায় মুসলমান যুবকদের হাতে হিন্দুদের নিগৃহীত হওয়ার কথা সজনীকান্ত দাস তাঁর ‘আত্মস্মৃতি’ তেও বলেছেন। তবে দাঙ্গার সব থেকে ভয়াবহ রূপ প্রকাশ পেয়েছিল ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের ১৬ আগস্ট। ‘দ্য গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং’ এর ঘটনার পর থেকে দাঙ্গা যেন কলকাতা মহানগরেরই একটা অঙ্গ হয়ে উঠেছে বলা যায়। এরপরে ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে, ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় দাঙ্গা হয়েছে। এই সব দাঙ্গার ক্ষেত্রে প্রায়শই দেখা গেছে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষেরা আক্রান্ত হয়েছেন, অত্যাচারিত হয়েছেন। পরবর্তীকালে ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দের দাঙ্গায় অনেকের ১৯৪৬ খ্রিস্টব্দের দাঙ্গার স্মৃতি ভেসে উঠেছে। যদিও ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দের দাঙ্গায় মৃত্যুর সংখ্যা কমছিল। দাঙ্গা শব্দটিকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন—

দাঙ্গা সেইরকম এক অস্বাভাবিক, অমানুষিক পরিস্থিতি, যখন 'মানবিকতা' শব্দটিকে নির্বাসনে পাঠানো হয়, ন্যায়-অন্যায়ের স্বীকৃত ভেদরেখাটি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, পারস্পরিক হত্যা অপরিহার্য বলে বিবেচিত হতে থাকে এবং হিংসা-বর্বরতা অদ্ভুত এক মাহাত্ম্য অর্জন করে।

এক একবার দাঙ্গা সংঘটিত হয় আর ইতিহাস খুঁড়ে তুলে আনা হয় দাঙ্গার রক্তাক্তস্মৃতি। সেই স্মৃতিতে হিংস্রতার নারকীয় কাহিনি যেমন আছে তেমনি সেখানে মানবিকতার শত-শত জল ঝর্ণার ধ্বনিও প্রতিফলিত হয়।

১৯৯২ খ্রিস্টাব্দের ৬ ডিসেম্বর করসেবকদের দ্বারা অযোধ্যায় বাবরি মসজিদের ধ্বংসের ঘটনা ঘটলে সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ে দাঙ্গার পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। মহানগর কলকাতাতেও সেই সময় দাঙ্গার আগুন জ্বলে উঠেছিল। ৬ ডিসেম্বর থেকে ১০ ডিসেম্বর পর্যন্ত মহানগর ছিল দাঙ্গাবাজের দখলে। আফসার আমেদ তাঁর 'ব্যথা খুঁজে আনা' উপন্যাসটিতে প্রত্যক্ষভাবে দাঙ্গা কবলিত কলকাতার পটভূমিকে নির্মাণ করেছেন। স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষের সাম্প্রদায়িক হানাহানির কদর্য ইতিহাসকে তিনি ৬ ডিসেম্বর থেকে ১১ ডিসেম্বরের ঘটনা প্রবাহের মধ্য দিয়ে উপস্থাপন করেছেন। কলকাতার মেটিয়াবুরুজ, তারাতলা ও ভিআইপি রোড সংলগ্ন খালাসিকোটায় হিন্দু-মুসলমান মানুষদের পারস্পরিক বিদ্বেষ পূর্ণ মনোভাব, দাঙ্গার ভয়াবহতা, মানুষের আতঙ্কের প্রহরযাপন, শুভ বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের মানবিক সংবেদনশীলতা— সবকিছুই ঔপন্যাসিক এই উপন্যাসে উপস্থাপন করেছেন ছয়-সাতটি পরিবারের কয়েকটি টুকরো টুকরো যাপন চিত্রের মাধ্যমে। ঔপন্যাসিক নিরপেক্ষভাবে মুসলিম জনবসতিপূর্ণ এলাকায় সংখ্যালঘু হিন্দুদের আতঙ্কের চিত্র যেমন উপস্থাপন করেছেন তেমনি হিন্দুদের এলাকায় মুসলিম পরিবারের অসহায়তার চিত্রও অঙ্কন করেছেন।

ভিআইপি রোড সংলগ্ন খালাসি কোটা পল্লিতে হিন্দু অধ্যুষিত এলাকায় নৌশাদ ও তার পরিবারের লোকজনেরা আতঙ্কে প্রহর যাপন করে। বাবরি মসজিদ ধ্বংসের যন্ত্রণার চেয়ে নিরাপত্তাহীনতার যন্ত্রণায় নৌশাদরা বেশি করে আক্রান্ত হয়েছে। শিক্ষিত শুভবুদ্ধি সম্পন্ন নৌশাদ উপলব্ধি করে যে ধর্মগ্রন্থের হরফ থেকে সাধারণ মানুষের মনে কোন মানবিক চৈতন্যের উদয় হচ্ছে না—

"তার মনেহয় একটা মসজিদ বা মন্দির তো কতকগুলো ইট=বালি=সুরকির উপাদান মাত্র, তাকে ঘিরে এমন পরিস্থিতি তৈরি হবে কেন? ধর্ম গ্রন্থগুলিতে কাগজ-কালি ও অক্ষরবিন্যাসের উপাদান থাকে। ধর্মের শুভচৈতন্য সেই উপাদান থেকে বেরিয়ে আসতে পারছে না।"

অস্থির এই সময়ে পাড়ার লোকজনের আচার-আচরণ বদলে যেতে থাকে। পরিচিত ব্যক্তিদের চোখের ভাষা ক্রমশ বদলে যায়, অবিশ্বাস, ঘৃণা আর হিংসার বারাবরণ নির্মিত হয়ে চলে। হিন্দু এলাকায় থেকে শুধুমাত্র মুসলমান বলে নৌশাদরা যেমন আতঙ্কিত থাকে মুসলিম মহল্লায় থেকে হিন্দু অনিল ঘোষেরাও তেমনি ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে থাকে। দেখা যায় প্রতিবেশী বরকতউল্লা এসে নিরাপদ আশ্রয় দিতে অনিল ঘোষদের নিজেদের বাড়িতে নিয়ে যায়। মানুষের জন্য মানুষের সহানুভূতিশীল ও মানবতাকে ঔপন্যাসিক বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন—

"আরো সুখের কথা, হিন্দু এলাকায় মুসলমান পরিবারকে নিরাপত্তা ও আশ্রয় দিয়েছে হিন্দু পরিবার। মুসলমান পরিবার হিন্দু পরিবারকে নিজের ঘরে আশ্রয় দিয়ে আগলে রেখেছে। এ-ঘটনা বিরল নয়।"

ধর্মের উর্ধ্বে উঠে মানুষ তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে মানুষকে রক্ষা করতে। মানুষের শুভবোধের কাছে শেষপর্যন্ত পরাজিত হয়েছে হিংসার রাজনীতি।

স্বাধীনতা উত্তরকালে বিশেষত আশির দশকের পরবর্তী সময়ে আমাদের দেশ ও সমকালীন ইতিহাস এক সন্ধিক্ষণে পৌঁছেছিল। আফসার আমেদ সেই সন্ধিক্ষণের মানুষের কথা বিশেষত উদ্বাস্তু মানুষ ও দাঙ্গা বিধ্বস্ত মানুষের কথা বিশেষভাবে বলেছেন তাঁর 'ব্যথা খুঁজে আনা' উপন্যাসে। দেশ ও রাষ্ট্রের সংকটকালীন সময়ে মানুষ ও মানুষের অবস্থান জানার ক্ষেত্রে তাঁর এই উপন্যাসগুলি বিশেষভাবে সহায়ক হয়ে ওঠে।

.....

‘ক্যাম্প সাহিত্য’ ও বাঙালির আত্মবিভাজন

শ্রী সৃজন দে সরকার

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অন্যতম সাহিত্যিক বাঁক এসেছিল স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে। সেই কালপর্বের অন্তর্গত সাহিত্যে যেমন বাস্তব থেকে অতিবাস্তব জীবন-জিজ্ঞাসা প্রকাশ পেতে শুরু করেছিল, ঠিক তেমনি মানুষের নূন্যতম জীবন-চিন্তার একটি ক্ষয়িষ্ণু অবস্থানও সূচীত হয়ে উঠেছিল- দেশভাগ ও তৎপরবর্তী সময়ের ছবি সরাসরি সাহিত্যে উঠে আসার মধ্যে দিয়ে। সেই সূত্রে আমরা আমাদের আলোচনাতে তিনটি ভিন্ন সংস্কৃতির প্রাসঙ্গিক বিষয়কে আলোচ্য করে তুলতে পারি। একটি হল অমিয়ভূষণ মজুমদারের লেখা ‘নির্বাস’ উপন্যাসটি, দ্বিতীয়তে সন্তোষকুমার ঘোষের লেখা ‘দ্বিজ’ শীর্ষক একটি ছোটগল্প এবং তৃতীয়টি ২০২১সালে নির্মিত কলকাতায় নাকতলা উদয়ন সংঘের দুর্গা পুজো’র সামগ্রিক শিল্প-নির্মাণ ‘চল-চিত্র’।

সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে অজস্র উদাহরণ মিলবে যেখানে দেশভাগ একটি বিষয় হয়ে উঠেছে, তবে বিশেষ করে উদ্বাস্তু হয়ে যারা দেশ ত্যাগী হয়ে এসে উঠেছিলেন একটি ‘ক্যাম্প’এর সংক্ষিপ্ততর চৌহদ্দির মধ্যে তাঁদের জীবন ও জীবনযন্ত্রণার কথা তুলে ধরতেই এই লেখা দু’টির আলোচনা করা। সমকালীন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ‘ক্যাম্পকেন্দ্রিক’ মানুষের জীবনের যে নতুন জীবনের সন্ধানে ব্রতী হয়ে ওঠা, সেই কথাই ধরা পড়বে আলোচনায়। সেইসঙ্গে, একটি পুজো’র মণ্ডপ-সজ্জার প্রসঙ্গও উত্থাপিত হবে। কারণ, ‘ক্যাম্প সাহিত্য’ হিসেবে ‘নির্বাস’ কিংবা ‘দ্বিজ’কে পড়তে গেলে আমাদের সামনে যে চিত্রগুলি ফুটে উঠতে চাইবে- তারই শিল্পসম্মত বাস্তব রুপায়ন ঘটেছে এই পুজোর শৈল্পিক নির্মাণে।

সামগ্রিক অর্থে, দেশভাগের ফলাফল হিসেবে যে রাজনৈতিক দোলাচলবৃত্তি তৎকালে দৃশ্যমান হয়েছিল, সেই অবস্থা থেকে অনেকটাই দূরবর্তী ছিলেন সেইসকল ‘ক্যাম্প’এর মানুষজন। ভারতের স্বাধীনতা এবং তৎসংলগ্ন পাকিস্তানের স্বাধীনতা প্রাপ্তি থেকে পূর্বভাগে পূর্ব পাকিস্তানের ‘বাংলাদেশ’ হয়ে ওঠা, অন্যদিকে পশ্চিমভাগে পাঞ্জাব ও অন্যান্য রাজ্যের সামরিক ও মানবিক অবস্থার উন্নয়নের সময়কালীন সাহিত্যের নানা সূত্র এই প্রসঙ্গে আলোচিত হবে।

ভারতের স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গেই যে মুক্তির আনন্দের পাশে, একটি বন্ধনদশার ইতিকথা রচনা শুরু হয়েছিল- রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক বিবেচনার মধ্যে দিয়েই- সেই দিকটিকেই একটি উপন্যাস ও একটি ছোটগল্পের মধ্যে দিয়ে আলোচনা করে দেখা যাবে। সেখানে বিমলা বা বিমলপ্রভা (নির্বাস’ উপন্যাসে) যে ভূমিকা নিতে পারে, কার্যত নিজ পূর্বপুরুষের মানমর্যাদা ভুলে নিশিকান্ত চক্রবর্তী’কেও (‘দ্বিজ’ ছোটোগল্পে) সেই স্থানে আসতে হয় ‘সুশীতল বিড়ি’র কারখানায় কাজ নিয়ে। দু’টি আখ্যানের মধ্যে বর্ণিত হলুদমোহন ক্যাম্প কিংবা মহিমপুর ক্যাম্প- কার্যত একই ক্যাম্পের ভিন্ন নাম।

বিষয়টিকে সর্বাঙ্গীণ অর্থে প্রকাশের জন্যে ‘ক্যাম্প সাহিত্য’ হিসেবে একজন মেয়ে হিসেবে বিমলা এবং একজন ব্রাহ্মণ সন্তান হিসেবে নিশিকান্ত চক্রবর্তীর কথা আলোচনাতে তুলে আনা হবে। সেই সূত্রে ভারতের স্বাধীনতার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও ‘ক্যাম্প সাহিত্য’এর স্বরূপ নির্ণয় করতে পারা যাবে। যেখানে, ভারতের স্বাধীনতার ৭৫তম বর্ষপূর্তির বছরে নির্মিত একটি দুর্গামণ্ডপ নির্মাণের চিন্তার সাম্য লক্ষ্যনীয় হয়ে ওঠে। এভাবেই, স্বাধীনতার একটি ভিন্ন বন্ধনকালীন ইতিহাসের আখ্যানের সূত্রকে আলোচনার মধ্যে দিয়ে উন্মোচিত করতে পারা সম্ভব হবে।